হিন্দু নারী

স্বামী অভেদানন্দ-রচিত বাংলা গ্রন্থাবলী

ভারতীয় সংস্কৃতি
যোগশিক্ষা
কর্মবিজ্ঞান
আত্মবিকাশ
স্তোত্র-রত্নাকর
পত্র-সংকলন
পুনর্জন্মবাদ
মনের বিচিত্র রূপ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম
স্বামী বিবেকানন্দ
আত্মজ্ঞান
পাতঞ্জলদর্শন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত পুস্তক

অভেদানন্দ-দর্শন

(স্বামী অভেদানন্দের মতের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা)

তীর্থরেণু

(স্বামী অভেদানন্দের ক্লাশ-লেক্‌চার)

শ্রীদুর্গা

(দেবী দুর্গার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা)

রাগ ও রূপ

(সংগীতের ঐতিহাসিক আলোচনা)

বাংলা ধ্রুপদমালা

(গান ও স্বরলিপি)

হিন্দু নারী

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	...	...	নয়
অবতরণিকা	...	...	এগারো-বত্রিশ
হিন্দুধর্মে নারী	...	...	১-৫২

নারীজাতি সম্বন্ধে লুই জ্যাকোলিও (Louis Jaccoliot)—ভারতবর্ষই বিশ্ব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিভূমি—সেমিটিক জাতি বা মোজেসের পূর্বেও হিন্দুসমাজবিধি বর্তমান ছিল—পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার—ঋগ্বেদের বিরাট্ ও প্রকৃতি—আচার্য সায়ণের এই সম্বন্ধে স্বীকৃতি—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট্ ও জেন্দাবেস্তার প্রমাণ—আদম ও ইভ—সেণ্ট পলের ধারণা সম্বন্ধে ডাঃ হফ্‌ডিঙ্ (Dr. H. Hoffding) ও ডাঃ অটো ফ্লাইডার (Dr. Otto Pfleiderer) —জেনেসিসের (Genesis) বর্ণনা—সৃষ্টি ও নারী সম্বন্ধে হিন্দুস্মৃতিকারগণ—ব্রহ্মবাদিনী রোমশা, লোপামুদ্রা, বাক্, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা ও ঘোষা প্রভৃতি—বৈদিকযুগে নারীজাতির বিদ্যানুশীলন ও প্রতিভা—যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী ও গার্গী-সংবাদ—মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয় ভারতী—খৃষ্টান মিশনারীদের মিথ্যা প্রচার—নারী সহধর্মিণী—নারীজাতি সম্বন্ধে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের স্বীকৃতি—নারী জগৎপ্রসবিত্রী জগজ্জননী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভৈরবী যোগেশ্বরী—তন্ত্রে নারীর অধিকার—নারী ভোগ্যা নহে, পূজ্যা—নারীজাতি সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস—হিন্দুনারীর শৌর্য—বীরনারী সরমা—বৈদিক নারীদিগের নাম—রাষ্ট্র-ব্যাপারে নারী—ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ—বীরনারী চাঁদবিবি—রাণী অহল্যাবাঈ—বাইবেল ও নারী—আদম ও ইভের প্রকৃত অর্থ—আমেরিকার নারীজাতি সম্বন্ধে বিশপ্ পটারকে (Bishop Potter) লিখিত মিসেস্ এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যাণ্টনের (Mrs Elizabeth Cady Stanton) পত্র ও বিবরণ—রোমান ও হিন্দু আইন—

বিষয়-সম্পত্তির অধিকারে নারী—হিন্দুনারী সম্বন্ধে মনীষী স্তর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়াম-সের (Sir. M. M. Williams) শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি—নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান সম্বন্ধে বিভিন্ন সংহিতা হইতে উদাহরণ—জন্মদাতা ও জ্ঞানদাতা গুরুর পার্থক্য—নারীজাতি সম্বন্ধে মহাভারত—হিন্দুনারীর বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীদের অপবাদ—মিসেস এফ. এ. ষ্টীলের (Mrs F. A. Steel) অভিমত—হিন্দুনারী সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মিঃ মিল—কোর্টশিপ্ প্রথায় বিবাহ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নয়—হিন্দু-বিবাহের আদর্শ—হিন্দুসমাজে বিধবা—বিবাহবিধি সম্বন্ধে হিন্দুস্মার্তগণের উদার মনোভাব—বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের স্বাধীনতা—মনোমালিন্য বা খামখেয়ালীকে হিন্দুধর্ম প্রশ্রয় দেয় না—বাল্যবিবাহ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নয়—বাগ্ দান-বিবাহ—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিবাহপদ্ধতি—হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্ম ও দৈবাদি বিবাহ—স্বয়ম্বর-বিবাহ—হিন্দুনারীর নৈতিক চরিত্রের উপর খৃষ্টান মিশনারীদের দোষারোপ—পণ্ডিতা রমাবাঈ—সতীদাহ—চিতারোহণ বা সতীদাহপ্রথা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রানুমোদিত নয়—সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহনের অবদান—ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী—সতীদাহ সম্বন্ধে স্তর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্ (Sir M. M. Williams)—হিন্দুনারীরা গঙ্গাগর্ভে শিশুসন্তান নিক্ষেপ করেন খৃষ্টান মিশনারীদের এরূপ মিথ্যা প্রচার—খৃষ্টান পাদরীগণের বিচিত্র মিথ্যা কাহিনীর সৃষ্টি—জগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে স্তর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামসের স্বীকৃতি—আমেরিকার সমাজ ও কলঙ্কের হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই—শিক্ষায় হিন্দুনারী—নারীজাতিকে শিক্ষাদান করা হিন্দুসমাজের কর্তব্য—দক্ষিণ ভারতের বিদুষী অব্যার—ভাস্করাচার্য্যের পত্নী লীলাবতি—ধর্ম সাধনায় হিন্দুনারী—বৌদ্ধসংঘনায়িকা মহাপ্রজাপতি—গোতমী—ভারতে হিন্দু-সন্ন্যাসিনী—শ্রীসারদাদেবী—ঈশ্বরের মাতৃভাব হিন্দুধর্মেরই গৌরবের বস্তু—নারী মহামায়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি—আদ্যাশক্তিরূপিনী নারীর অর্চনায়ই ভারতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে—জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা গীতি।

নারীজাতিমাত্রেই জগজ্জননীর অংশ—নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যানুভূতি—শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বর্তমান জগতে সমগ্র নারীজাতিকে শ্রদ্ধায় ও সম্মানে সমুন্নত করিয়াছেন—নারীজাতির উন্নতিই ভারতের কল্যাণের কারণ —ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন সমস্তই নারিদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে—নারীজাতির প্রতি হিন্দুসমাজের দায়িত্ব—বৈদিকযুগে স্ত্রীশিক্ষা—পরিষদ, সংসদ বা সভা বৈদিকযুগেও ছিল—বৈদিকযুগে নারীরা ব্রহ্মবিচার-সভায় বিচার করিতেন—প্রকৃত নারীশিক্ষার দিকে হিন্দুসমাজের উদাসীনতা—নারীশিক্ষাকেন্দ্রে নারী শিক্ষয়িত্রীই প্রয়োজন—স্বাধীন আমেরিকার নারীজাতি—আমেরিকার সমাজে বাল্যবিবাহ নাই—পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে বাল্যবিবাহের ইঙ্গিত—থেরাপুত্ত ও এসিনি সম্প্রদায়ে নারী—ভারতবাসী-মাত্রেরই কুপ্রথার স্রোতকে প্রতিরোধ করা উচিত—পিতামাতাগণের দায়িত্ব কন্যাদের সুশিক্ষিতা করা।

শিক্ষা ও নারী ... ... পৃ° ৫৩-৬২

সঞ্চয়ন ... ... পৃ° ৬৩-৭৬

(১) বাঙ্গালোর ছাত্রসম্মিলনীর উদ্দেশ্যে পৃ° ৬৫
(২) মহীশূর ছাত্রসম্মিলনীর অভিভাষণে „ ৬৬
(৩) কলিকাতার ছাত্রসংসদে ... „ ৬৬
(৪) এলাহাবাদ অভিভাষণে ... „ ৬৮
(৫) আমেদাবাদ বক্তৃতায় ... „ ৬৯
(৬) বোম্বাই অভিভাষণে ... „ ৬৯
(৭) বহরমপুর অভিভাষণে ... „ ৭০
(৮) জামসেদপুর বক্তৃতায় ... „ ৭১
(৯) ভারতীয় সংস্কৃতি ... „ ৭৫
(১০) শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও বাণী ... „ ৭৬

পরিশিষ্ট ... ... পৃ° ৭৭-১৪৮
(পাদটীকা)

প্রকাশকের নিবেদন

'হিন্দুনারী' নূতনরূপ ও উপকরণে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ অনেক আগেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাজের দরুণ যথাসময়ে ইহার পুনর্মুদ্রণ করিতে বিলম্ব হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। বর্তমান পরিবর্ধিত এই তৃতীয় সংস্করণে স্বামী অভেদানন্দের মূল রচনাবলী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইল। স্বামী অভেদানন্দ 'হিন্দুধর্মে নারী' (*Woman's Place in Hindu Religion*) বক্তৃতাটী হিন্দুনারীর আদর্শ-সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রদান করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা বিশেষ করিয়া খৃষ্টান মিশনারীদিগের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। নিউ ইয়র্কের তদানীন্তন বিশিষ্ট নাগরিক ও ধর্মযাজক মনীষী বিশপ্ পটার (Bishop Potter) সেই বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতায় আনন্দিত হইয়া সমবেত খৃষ্টান মিশনারী ও বিদ্বৎসমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন: 'Swami Abhedananda is a scholar and a gentleman. What he says about Hindu women is correct and true.' 'নারী ও শিক্ষা' অংশটী মাদ্রাজে প্রদত্ত *Address on Femal Education* বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে যখন তিনি প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন সেই সময়ে মাদ্রাজ জর্জ্জ টাউন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস বালিকা-বিদ্যালয়ে' এই বক্তৃতাটী দিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই হিন্দু-পত্রিকায় (*The Hindu*) প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টি ছিল যাহা-কিছু সত্য ও সুন্দর তাহারই অনুগামী। 'হিন্দুনারী'-প্রসঙ্গে তিনি যেমন হিন্দুনারীর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যবাসীর বিসদৃশ ধারণার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তেমন পাশ্চাত্যবাসীর যাহা কিছু ভাল, পাশ্চাত্যের যাহা কিছু স্বভাব-সুন্দর সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে তিনি হিন্দুনারীর সম্মুখেও উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং 'হিন্দুনারী' তাহার মাধুর্য ও মহিমায় হিন্দুজাতির আচার, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ধারাকে চিরসমুজ্জ্বল করিয়া ভারত ও ভারতের জাতির কল্যাণ সাধন করুক ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

"হিন্দুনারী" সম্পাদনা করিয়াছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। "নারী ও শিক্ষা" ও "সঞ্চয়ন" অধ্যায় দুইটি তিনি এই গ্রন্থে সংযোজন করিয়াছেন। "সঞ্চয়ন" অংশটি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে আলোচিত হিন্দুনারী-প্রসঙ্গের একত্র সন্নিবেশ। সমগ্র গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ ও সুশোভন করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় সম্পাদক তাঁহার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ "অবতরণিকা" ও "পরিশিষ্ট" (পাদটীকা) সংযোজিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি বাংলাসাহিত্যের যে একটি অমূল্য সম্পদ-রূপে পরিগণিত হইবে এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৫৭ সাল

অবতরণিকা

হিন্দুসমাজে নারীর অধিকার, শ্রদ্ধা, সম্মান, শিক্ষা, প্রব্রজ্যা, বিবাহ প্রভৃতি সকল বিষয়ই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'হিন্দুনারী' পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। এই নূতন সংস্করণে তাঁহার লিখন ও বিকাশভঙ্গীকে আরও বিচিত্র ও উজ্জ্বল করিবার জন্য আমরা অবতরণিকা, পাদটীকা ও পরিশিষ্ট সংযুক্ত করিয়াছি।

হিন্দুসমাজে নারীজাতির উপনয়ন-সংস্কার বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত ছিল। 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে আমরা ইহার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' (১ খৃ° পৃ° ২৪) এবং 'সংস্কারপ্রকাশ' বইয়ে (পৃ° ৪৯২) দেখা যায়, হারীতের মতে, নারীগণ ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—'তত্র ব্রহ্মবাদিনী-নামুপনয়নমগ্নীবন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি। সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে কথং চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্যঃ ॥' উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন হইত; তাঁহারা সকলে অগ্নিচয়ন, বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাচর্যা করিতেন। সদ্যোবধূদিগের বিবাহের পূর্বে উপনয়নমাত্র সম্পন্ন হইয়া বিবাহ হইত। গোভিলগৃহ্যসূত্রে (২.১.১৯) আছে: 'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ জপেৎ সোমো দদদ্গন্ধর্বা-য়েতি',—বিবাহের বধূ যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয়কে বন্ধন করিলে বর ঋগ্বেদের 'গন্ধর্বায়েতি' (১০.৮৫.১৪১) মন্ত্রটী পাঠ করিবেন। সূত্রভাষ্যকারও 'ন তু * যুক্তং স্ত্রীণাং যজ্ঞোপবীতধারণানুপপত্তেঃ (সংস্কারতত্ত্ব, পৃ° ৮৯৫) বলিয়া নারীদের যজ্ঞসূত্রধারণ শাস্ত্রীয় হিসাবে অনুমোদন করিয়াছেন। গোভিলের মতে, উপনয়নের চিহ্নরূপে

নারীগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। স্মার্ত রঘুনন্দন একথা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু মহাভারতে (বনপর্ব° ৩০৫·২০) আমরা উল্লেখ দেখিতে পাই : 'ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ। মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্নথর্বশিরসি শ্রুতম্॥'—একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডবজননী কুন্তীকে অথর্বশির হইতে পবিত্র সাবিত্রীমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। হারীতও 'প্রাগ্রজসঃ সমাবর্তনম্' বলিয়া নারীর যজ্ঞসূত্র-ধারণের অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। যম বলিয়াছেন : 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥' মহর্ষি মনু ইহা অন্যপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উদারতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : 'অমন্ত্রিকা তু কার্যাৎ স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ, এবং 'বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিষ্ক্রিয়া॥' (২·৬৬-৬৭)। পণ্ডিত কানে তাঁহার *History of Dharmasastra* পুস্তকে এসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : 'Manu seems to have been aware of this usage as prevalent in ancient time if not his own,' কিন্তু 'in the day of the Manusmriti, Upanayana for women had gone out of practice, though there were faint glimmerings of its performance for women in former days' (p. 295)। মনুর সময়েই নারীর উপনয়নপ্রথা একরকম লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তবে স্মৃতিচন্দ্রিকা, নির্ণয়সিন্ধুকার প্রভৃতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, নারীদের যজ্ঞসূত্রধারণে অধিকার এককালে ছিল। পণ্ডিত কানে কাদম্বরী হইতে 'ব্রহ্মসূত্রেণ পবিত্রীকৃতকায়াম্'—এই উদাহরণটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পণ্ডিত বাণভট্টের সময়েও নারীদিগের উপনয়নপ্রথা বর্তমান ছিল।

বৈদিক এবং পৌরাণিকযুগে নারীজাতির বানপ্রস্থাশ্রমে যে অধিকার ছিল তাহার প্রমাণের অভাব নাই। মহাভারতের আশ্রমবাসীপর্বে (১৯ অ°) দেখা যায়, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পত্নী গান্ধারীর সহিত অজিনবাস এবং মৃগচর্ম পরিধান করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পরাশরমাধ্বীয় (১খ°, ২অ°, পৃ° ১০৯) মনুর ৬অ° ২ শ্লোক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া নারীদের বানপ্রস্থাশ্রমের কথা স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতের মৌষলপর্বে (৭'৭৪) দেখা যায়: 'সত্যভামা তথৈবান্যা দেব্যঃ কৃষ্ণস্য সংমতাঃ। বনং প্রবিবিশু রাজংস্তাপস্যে কৃতনিশ্চয়াঃ॥'— শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিবার পর সত্যভামা প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্বেও (১২৮'১২-১৩) আছে, পাণ্ডুরাজের মৃত্যুর পর সত্যবতী বনে গমন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্বে (১৪৭'১০) এবং আশ্রমবাসীপর্বেও (৩৭'২৭-২৮) ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

নারীজাতির প্রতি হিন্দুসমাজ প্রায় সকল সময়ে ঠিক একভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়া আসিয়াছে। মহাভারতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়; যেমন: 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্'—(শান্তিপর্ব ১৪৪'৬)। 'নাস্তি ভার্যাসমো বন্ধুঃ নাস্তি ভার্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্মসংগৃহে'—(শান্তিপর্ব ১৪৪'১৬)। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে (৩০'২) নারীজাতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: 'কুসুমধর্মাণো হি যোষিতঃ'—নারীরা কুসুম তুল্য পবিত্র। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (১'৪'১৪'১৮) দেখা যায়: 'পতিবয়সঃ স্ত্রিয়ঃ'—স্বামীর বয়সানুসারে পত্নীকেও শ্রদ্ধা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। বাশিষ্ঠসংহিতাও (১২'৪২-৪৩): 'যে চৈব পাদগ্রাহ্যাস্তেষাং ভার্যা গুরাশ্চ। মাতাপিতরৌ চ' বলিয়া নারীদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণ

সমর্থন করিয়াছেন। তবে মনু (২ অ° ১৩১-১৩২) বয়সের আধিক্য ও জাতির-বিচারেই বেশী জোর দিয়াছেন দেখা যায়। 'সংস্কারপ্রকাশ' বইয়ে (পৃ ৪৭১) দেবল ও ঔশনস : 'মাতা মাতামহী গুর্বী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরাঃ। শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্ত্রিয়ঃ ।।' বলিয়া নারীজাতির অধিকারে বেশ ঔদার্য দেখাইয়াছেন। তবে গৌতম ও হরদত্ত কেবল ছাত্রদিগের পক্ষেই 'আচার্যতৎপুত্রস্ত্রীদীক্ষিতনামানি'— আচার্য এবং আচার্যের পুত্র ও পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। অভিবাদননিয়মে মনু : 'নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং * * স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব চ' (২·১২৩) স্ত্রীলোকদিগকেও অভিবাদন করা কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মেধাতিথি বলিয়াছেন—'স্ত্রিয়োঽপ্যেবমেব। সর্বগ্রহণং গুরুপত্নীনাং সংস্কৃতপ্রয়োগজ্ঞানামপি।' কল্লুকভট্ট 'স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তথৈব ব্রুয়াৎ' বলিয়া নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্বীকার করিয়াছেন। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (১·৪·১৪ ২০-২২) উল্লেখ দেখা যায় : 'সর্বনাম্না স্ত্রিয়ো রাজন্যবৈশ্যৌ চ। ন নাম্না। মাতরমাচার্যদারং চৈকে।'

নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে 'হিন্দুনারী'-র বিষয়বস্তুতে এবং পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে আত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা (ঋক্° ৫·২৮), অপালা (ঋক্° ৮·৯১) কাক্ষীবতী ঘোষা (ঋক্° ১০·৩৯), মৈত্রেয়ী ও গার্গী (বৃহ° উ° ২·৪·১, ৩·৬-৮) প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সর্ববিদ্যায় নারীজাতির অধিকার ছিল। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' বইয়ে বৃহস্পতি (২ অ°, পৃ° ১৯৫) উল্লেখ করিয়াছেন : 'বিজ্ঞানমুচ্যতে শিল্পং হেমকুপ্যাদিসংস্কৃত। নৃত্তাদিকং চ যৎপ্রাপ্তুং কর্ম কুর্যাদ্ গুরোগৃহে ॥' যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় মিতাক্ষরাও (২ অ° ১৮৪) নারীদিগের পক্ষে শিল্প-শিক্ষায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের নির্দেশ দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫·৪·১৭) দেখা যায় : 'অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ

সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়তে ** মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্ *।' অর্থাৎ সুপণ্ডিত ও সভা-সমিতিতে সুভাষিত পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে অন্নের সহিত বলিষ্ঠ বৃষের মাংস রন্ধন করিয়া পত্নীকে খাওয়াইবার বিধি যেমন প্রবর্তিত ছিল, কন্যার সম্বন্ধেও সেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে: অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত ** তিলৌদনং প্যচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নায়াতাম **।' অর্থাৎ 'আমার দুহিতা সুপণ্ডিতা ও আয়ুষ্মতী হউক' এরূপ যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে তিনি তৈলের সহিত অন্ন রন্ধন করিয়া ঘৃত সহ তাহা পত্নীকে ভোজন করাইবেন (৬'৪'১৭)। এবিষয়ে ভাষ্যকার শংকর ঠিক উদারতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: 'দুহিতুঃ পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽনধিকারাৎ।'—দুহিতার 'পাণ্ডিত্য' শব্দে গার্হস্থ্যশাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই বুঝিতে হইবে, কারণ স্ত্রীলোকদিগের বেদে অধিকার নাই। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া টীকাকার আনন্দগিরি মন্তব্য করিয়াছেন: 'দেশবিদেশাপেক্ষয়া বা মাংসনিয়মঃ।' আচার্য শংকর এবং আনন্দগিরির অভিমত অবশ্যই বিচার্য বিষয়, কারণ আরণ্যকের সময়ও যে নারীদিগের সর্ববিষয়ে সুশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সংহিতাকার হারীত ও যম 'অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্র বাচনং তথা' (সংস্কারপ্রকাশ, পৃ° ৪০২-৪০৩) বলিয়া নারীজাতির বেদ, উপনয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্রে অধিকার দান করিয়াছেন। পাণিনির ৪.১০.৫৯ এবং ৩''৩২১ সূত্রের উপর কাশিকাবৃত্তি 'আচার্য' ও 'উপাধ্যায়' শব্দ দুইটি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহাদের নারীশিক্ষক অর্থ করিয়াছে; যেমন: 'কাশকৃৎস্নিনা প্রোক্তা মীমাংসা কাশকৃৎস্নী কাশকৃৎস্নীমধীতে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী'। প্রাচীনকালে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না নারীশিক্ষকেরা যে বিদ্যমান ছিলেন তাহাই কাশিকাবৃত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার

পতঞ্জলি (২ খ°, পৃ° ২০৫, পাণিনিসূত্র ৪'১'১৪, বার্তিক ৩) বলিয়াছেন : 'আপিশলমধীতে ব্রাহ্মণী আপিশলা ব্রাহ্মণী।' 'আপিশলা' অর্থে যে নারীরা আপিশলির ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন তাঁহারা। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে : 'ঔদমেধ্যায়াশ্ছাত্রা ঔদমেধাঃ' কথার উল্লেখ করিয়াছেন। 'ঔদমেধাঃ' অর্থে যে নারীরা নারীশিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা। গোভিলগৃহ্যসূত্রে (২'১'১৯-২০) উল্লিখিত আছে : 'পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্ঠিতম্' এবং বধূকে বর 'প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাম্' বেদের এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। কাঠকগৃহ্যে উল্লিখিত আছে যে, বর ও বধূ দুইজনেই বেদোক্ত 'সরস্বতি প্রেদমবে' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পণ্ডিত কানে বলিয়াছেন : 'All this shows that women could recite Vedic mantras in the sutra period' (*p. 367*),—সূত্রযুগে সমস্ত নারীর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার ছিল। কামসূত্রে (১'২'১-৩) বাৎস্যায়ন ৬৪ কলা শিক্ষা করিবার জন্য নারীদের উপদেশ দিয়াছেন। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য এবং নাটকে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। কালিদাস এই বিষয়ে শকুন্তলার উদাহরণ দিয়াছেন যে, শকুন্তলা তাঁহার প্রিয়তমকে পত্র লিখিয়া পাঠাইতেছেন। মালতীমাধবে ভবভূতি উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামাতাগণ তাঁহাদিগের যৌবনাবস্থায় আচার্যদিগের সমীপে কামন্দকীসহ বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

পণ্ডিত কানে উল্লেখ করিয়াছেন : 'But gradually the position of women became worse and worse. In the Dharmasutras and Manu woman is assigned a position of defence and even women of higher classes came to be looked upon as equal to Sudras so far as Vedic study * *' (*p. 367*)। বাস্তবিক দেখা যায়, জৈমিনি তাঁহার

পূর্বমীমাংসায় (৬'১'১৭-২১) যজ্ঞকার্যে পুরুষদিগের সহিত নারীদের সমান অধিকার দান করিয়াছেন, কিন্তু ৫'১'২৫ সূত্রে তিনি আবার সে উদারতা ঠিক রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: 'তস্যা যাবদুক্তমাশীর্ব্রহ্মচর্যমতুল্যত্বাৎ'—নারী যজ্ঞকার্যে যোগদান করিলেও স্বামীর সহিত একত্রেই কার্য করিবেন—বিশেষ করিয়া 'আর্ধ' প্রভৃতি কয়েকটী নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণের সময়; কারণ পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা এক নয়। ভাষ্যকার শবর স্বামীও আচার্যের অনুসরণ করিয়াছেন, যেমন: 'অতুল্যা হি স্ত্রী পুংসা। যজমানঃ পুমান্ বিদ্বাংশ্চ পত্নী স্ত্রী চাবিদ্যা চ'। শবর স্বামী যজমানকে পুরুষ ও বিদ্বান্ বলিয়াছেন, কিন্তু যজমানের পত্নীকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিতা করিয়া 'অবিদ্যা' আখ্যা দিয়াছেন। তাহার পর 'ভবৎ পূর্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো * *' (২'৪৯) মনুর এই শ্লোকটীর উপর মন্তব্য করিতে গিয়া ভাষ্যকার মেধাতিথি বেশ একটু চাতুর্য দেখাইয়াছেন। নারীদের পক্ষেও উপনয়নের পর ভিক্ষা করিবার সময় 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এই বৈদিকবাক্য উচ্চারণ করিবার বিধি আছে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে বেদে অধিকার দেওয়া হয় নাই; কাজেই অনধিকারিণী হইয়াও নারীরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ কেন করিবেন ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন: 'স্বল্পাক্ষরং চৈতৎপদত্রয়ং সর্বত্র প্রসিদ্ধং স্ত্রীভিরপি সুজ্ঞাতম্,'—ঐ বেদ মন্ত্র অল্পাক্ষর বলিয়া নারীদের পক্ষে উচ্চারণে দোষ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তাহা বিচার্য।

ইহা ছাড়া ঋগ্বেদের ৮'৩৩'১৭ মন্ত্রে নারীদিগের নিন্দাও করা হইয়াছে, যেমন: 'ইন্দ্রশ্চিদ্ধা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ। উতো অহ ক্রতুং রঘুম্ ॥'—ইন্দ্র বলিলেন, নারীদের মন দমন করা যায় না, তাহারা বুদ্ধি এবং শক্তিহীন। পুনরায় ১০'৯৫'১৫-ঋকে বলা হইয়াছে: 'ন বৈ

স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা।'—নারীর সহিত বন্ধুত্ব করায় কোন সার্থকতা নাই, কেননা স্ত্রীলোকদের হৃদয় ব্যাঘ্রতুল্য ক্রূর। শতপথব্রাহ্মণে (১৪.১.১.৩) উল্লিখিত হইয়াছে, মধুবিদ্যা যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারা নারী, অমঙ্গলস্বরূপ শূদ্র, কুক্কুর এবং কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী প্রভৃতি দর্শন করিবে না।

সভা ও সমিতির কথা বেদ, ব্রাহ্মণ ও সংহিতা প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে দেখা যায়। সেই সমস্ত সভা, সমিতি বা পরিষদে পুরুষদের ন্যায় নারীরাও যোগদান করিতেন। ঋগ্বেদে (১০.৩৪.৬) 'সভা' এবং (১০.৯৭.৬) 'সমিতি' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬.৪.১৭) আছে: '* * পুত্রো * * সমিতিংগমঃ' এবং ৬.২.১ শ্লোকে বলা হইয়াছে 'শ্বেতকেতুর্হ আরুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম।' ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫.৩.১) দেখা যায়, পাঞ্চাল-সমিতিতে প্রবাহন জৈবলি শ্বেতকেতু আরুণেয়কে দর্শন সম্বন্ধে পাঁচটী রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়। তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ * *।' গৌতমীয় (২৮.৪৬) এবং আপস্তধর্ম্মসূত্রে (১.৩.১১.৩৪) 'পরিষদ্'-কথার উল্লেখ আছে। ঐ সম্বন্ধে বৌধায়ন (১.১.৪৪-৪৫) এবং বশিষ্টধর্ম্মসূত্র (১.১৬) দ্রষ্টব্য। গৌতমীয়সূত্রে (২৮.৪৬-৪৭) দেখা যায়: 'আশ্রমস্থাস্ত্রয়ো মুখ্যাঃ পর্ষদেষাং দশাবরা',—পরিষদ ১০ জন সভ্যকে লইয়া গঠিত হইবে। বাজসনেয় (৩.২০), বৌধায়ন (১.১.৮), পরাশর (৮.২৭) এবং আঙ্গিরস প্রভৃতিতে সভা ও পরিষদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর সন্ন্যাস সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া পরাশর (৮.১৩) বলিয়াছেন: 'বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোপি পরিষদ্ ভবেৎ।' আঙ্গিরস বলিয়াছেন: 'শিরোব্রতেন স্নাতানামেকোপি পরিষদ্ ভবেৎ।'

বালিকাদের বিবাহকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, যদিও নারীজাতির বিবাহ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে সুনির্দিষ্ট একটী সময়ের ব্যবস্থা আছে তথাপি পরিণত বয়স বা তদূর্ধ কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবিবাহিত থাকিতে দেখা যাইত ('হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিত কানে তাঁহার *History of Dharamasastra* পুস্তকে ঋক্° ১০'২৭'১২ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'The shows that girls were grown-up enough to select their husbands' (*p. 439*)। ঋক্° ১'১২৪'৭, ২'১৭'৭, ১০'১২৪'৭ এবং অথর্ব° ১'১৭'১ মন্ত্রেও ঐ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঋক্° ১০'৮৫' ২৬-২৭ এবং ৪৬ মন্ত্র অনুসারে দেখা যায়: 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্াং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু' (ঋক্° ১০'৮৫'৪৬),— বালিকারা বিবাহকালে পরিণতবয়স্কাই থাকিত। কিন্তু ১'১১৬'১-ঋকে আবার উল্লিখিত দেখা যায়, নাসত্যগণ যখন বিমদার বিবাহ দিয়াছিলেন তখন তিনি 'অর্ভগ্' অর্থাৎ অপরিণত বয়স্কা ছিলেন: 'যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা ন্যূহতূ রথেন।' ১'১২৬'৬-৭ ঋক্ দুইটীও ঐ অপরিণত বয়স্কা বালিকা-বিবাহের ইঙ্গিত বলা যায়। ১'৫১'১৩-ঋকে পুনরায় আছে, ইন্দ্র বৃদ্ধ কাক্ষীবতকে বৃচয়া নাম্নী অর্ভা অর্থাৎ বালিকা-কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উষস্তি ঋষির বালিকা-বধূ-বিবাহের আর একটী উদাহরণও পাওয়া যায় ('হিন্দুনারী', পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিত কানে এসম্বন্ধে বলিয়াছেন: 'On the whole, one may conclude that in the period of the Rigveda girls were probably married at any age (either before puberty or after puberty) and sometimes remained spinsters all their life' (*p. 440*)। নগ্নিকা, অনগ্নিকা প্রভৃতি

সম্বন্ধে আলোচনা 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। পরিশেষে এই বালিকা-বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিত কানে মন্তব্য করিয়াছেন : 'From about 600 B. C. to about the beginning of the Christian Era it did not matter at all if a girl was married a few months or few years after puberty. But by about 200 A. D. (when the Yaj. Smriti was composed) popular feeling had become insistent on pre-puberty marriages' (*p. 443*)। সম্বর্তসংহিতায় (৬৪ এবং ৬৭ শ্লোক) বালিকা-বিবাহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। লৌগাক্ষিগৃহ্যসূত্রে (১৯.২) দেখা যায় : 'দশবার্ষিকং ব্রহ্মচর্যং কুমারীণাং দ্বাদশবার্ষিকং বা।' বৈখানসে (৬.১২) আছে : 'ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং নগ্নিকাং গৌরীং বা কন্যাং * * বরয়েৎ। অষ্টবর্ষাদ্বাদশমান্নগ্নিকা।' মহাভারত, অরণ্যকাণ্ডে (৪৭.১০-১১) আছে, শ্রীরামচন্দ্রের বয়স যখন ১৩, তখন তিনি ৬ বৎসর বয়স্কা সীতা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কানে এই অংশকে 'passage appears to be an interpolation.' (*p. 445*), অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন।

ইহা ছাড়া অসবর্ণ-বিবাহও হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণে (৪.১.৫) দেখা যায়, ভৃগু বা আঙ্গিরস বংশীয় ঋষি চ্যবনের সহিত মনুর বংশধর শর্যাতের কন্যা সুকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বৃহদ্দেবতা (৫.৫০) ঋগ্বেদের ৫.৬১.১৭-১৯ মন্ত্রগুলির উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে,—অব্রাহ্মণ রাজা রথবীতি দারভ্যের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে আট রকম বিবাহপদ্ধতির প্রচলন ছিল। তাহাদের মধ্যে পিশাচ, রাক্ষস ও আসুর বিবাহকে অনেকে অপরিণত সামাজিক পদ্ধতি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। গান্ধর্ব বা পরস্পর ভালবাসাজনিত

বিবাহকে অনেকে নিন্দনীয় অথবা প্রশংসনীয় বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ ও আপস্তম্বধর্মসূত্র পিশাচ-বিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন। তাহাদের মতে, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও আসুর এই তিন প্রকারের কোন বিবাহই প্রশংসনীয় নয়।

রাক্ষস-বিবাহকে অনেকে ক্ষাত্রবিবাহ নামে উল্লেখ করিয়াছেন; স্মৃতিতেও এ'কথার নজির পাওয়া যায়। ক্ষাত্রবিবাহ বলিবার উদ্দেশ্য—নারীরা যেন যুদ্ধজয়ের উপঢৌকন-রূপে এক সময়ে ক্ষত্রিয়সমাজে গণ্য ছিলেন। যুদ্ধজয়ী বীর কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করিতেন। মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিবাহের কারণ সম্বন্ধে ডাঃ আল্‌টেকর উল্লেখ করিয়াছেন: "In this marriage the victor carried away the bride and married her. The fight was necessary either because women offered real resistence on account of the ill-treatment which they received from their husbands in primitive society, or because parents were unwilling to lose the services of their daughters, or because it was regarded as a point of honour for a warrior that he should have for his wife a women, whom he could point out also as a trophy of war" (—*The Position of Women in Hindu Civilisation*, p. 44)। মহাভারতে (১।২৪৫।৫-৬) ক্ষাত্রবিবাহকে প্রশংসা করা হইয়াছে—

"ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্যেণ প্রশস্তং হরণং বলাৎ,
অতঃ প্রসহ্য হৃতবান্ কন্যাং ধর্মেণ পাণ্ডবঃ।"

মহাভারতে দেখা যায়, অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে, ভীষ্ম কাশীরাজের

কন্যা অম্বাকে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য হরণ করিয়াছিলেন। মহাভারত ছাড়া ঋগ্বেদে (১।১১৬) পাওয়া যায়, বিমদ যুদ্ধ জয় করিয়া পত্নীলাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষাত্রবিবাহ কিন্তু খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ক্ষত্রিয়-রাজগণ কর্তৃক ক্রমশ অনাদৃত হয় (—"It is clear that though the Kshatra marriage continued to be recognised by Smritis and Epics, it had ceased to be approved even by enlightened Kshatriya in 3rd century B. C.")।

আসুরবিবাহে পুরুষ নারীকে বিবাহ করিত পণ বা অর্থের বিনিময়ে। অবশ্য এই পণগ্রহণপ্রথা আধুনিক সমাজেও প্রচলিত আছে, যাহা প্রশংসনীয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। তবে আসুরবিবাহ ক্ষাত্র বা গান্ধর্ববিবাহ হইতে যে অনেকাংশে ভাল তাহা স্বাকীর্য। বৈদিক সমাজেও আসুর বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিবাহ বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত না। পালিসাহিত্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। থেরীগাথা (১২ এবং ১৫৩ শ্লোক) ও ধর্মপাদে (২১৫ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য) এই বিবাহের ইঙ্গিত আছে। পুরাণে কৈকেয়ী, গান্ধারী, মাদ্রী প্রভৃতির আসুরবিবাহের উল্লেখ আছে। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে এই ধরণের বিবাহকে যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে। বৌধায়ণ বলিয়াছেন: "ক্রীতা দ্রব্যেণ যা নারী সা ন পত্নী বিধীয়তে, সা ন দৈবে ন সা পিত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ" (বৌধীয়ণধর্মসূত্র ১।১১।২০-২১)। অত্রিসংহিতায়ও (৩৮৪ শ্লো°) আছে: "ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা ন সা পত্নী বিধীয়তে, তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডো ন বিদ্যতে"। পদ্মপুরাণে এই কন্যাবিক্রয়ের বিবাহকে নিন্দা করা হইয়াছে—"কন্যাবিক্রয়িণাং ব্রহ্মন্ পশ্যেদ্বদনং বুধঃ" (২০, ৬ শ্লো°)।

গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রবিধিসংগত। এই বিবাহ সম্বন্ধে বৌধায়ণধর্মসূত্র

(১।১১।১৩, ৭) বলিয়াছেন : "গান্ধর্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ"। কামসূত্রে (৩।৫।৩০) এই পদ্ধতির যথেষ্ট প্রশংসা করা হইয়াছে: "অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্বঃ প্রবরো মতঃ"। মহাভারত (১৩।৪৪) এবং মনুসংহিতা (৩।২৩-২৫) গান্ধর্ববিবাহকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। মহাভারতে ৪।৯৪।৬০ শ্লোকে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে গান্ধর্ববিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—"ক্ষত্রিয়স্য তু গান্ধর্বো বিবাহঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে"।

স্মার্তকারেরা ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য ও আর্ষ এই চারিপ্রকার বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়াছেন। বিবাহের বয়স, প্রথা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ডাঃ এ. এস. আল্‌টেকর প্রণীত *The Position of Women in Hindu Civilisation* (1938), pp. ৫৮—১০৫ এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্: *Religion and Society* (1947), pp. 165—167 দ্রষ্টব্য।

স্বয়ম্বর-বিবাহ সম্বন্ধে 'হিন্দুনারী'-তে আলোচিত হইয়াছে। ধর্মশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ অত্যন্ত কম দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির (১·৬১) উপর বীরমিত্রোদয়টীকা হইতে জানা যায়: 'ত্বং মে পতিস্ত্বং মে ভার্যেত্যেবং কন্যাবরয়োঃ পরস্পরং নিয়মবন্ধাৎ পিত্রাদিকর্তৃকদাননিরপেক্ষাদ্যো বিবাহঃ স গান্ধর্ব ইত্যর্থঃ। * * এবং চ স্বয়ং বরোপি গান্ধর্ব-বিবাহ এব।' ধর্মশাস্ত্রে যে গান্ধর্ব-বিবাহের উল্লেখ আছে, স্বয়ম্বর বিবাহ প্রকৃতপক্ষে তাহারই নামান্তর মাত্র। বাজসনেয়ধর্মসূত্র (১৭·৬৭-৬৮), মনু° (৯·৯০), বৌধায়নধর্মসূত্র (৪·১·১৩) প্রভৃতিতে যে স্বয়ম্বর-বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও বর পাওয়া না গেলে তবে ঐ প্রথা অনুষ্ঠিত হইত। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (১·৬৪) প্রত্যেক মাতাপিতাহীন অনাথা বালিকার পক্ষে স্বয়ং পতি-

নির্বাচনের জন্য স্বয়ম্বর-বিবাহের বিধি দিয়াছেন। এই প্রকার স্বয়ম্বর সকল বর্ণের বালিকার জন্য বিহিত ছিল। কিন্তু মহাভারতে (আদিপর্ব ১০২.১৬) দেখা যায়: 'স্বয়ংবরং তু রাজন্যাঃ প্রশংসন্ত্যপযান্তি চ। প্রমথ্য তু হৃতামাহুর্জ্যায়সীং ধর্মবাদিনঃ॥' কিন্তু রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বরপ্রথা পরবর্তীকালে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। যেমন, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিয়াছিলেন। সাবিত্রী রথারোহণে গমনকালে নিজ মনোমত পতি নির্বাচন করিয়াছিলেন। সীতা বা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহাদিগকে মনোমত পতি-নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। একমাত্র দময়ন্তী ও ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরই তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার অনুসারে হইয়াছিল।

ঋগ্বৈদিক যুগে যদিও পুরুষদিগের পক্ষে একটী মাত্র বিবাহ (monogamy) প্রচলিত ছিল, তথাপি বহুবিবাহও সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। পণ্ডিত কানে এসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন: 'Though monogamy seems to have been ideal and probably the rule, the Vedic literature is full of references to ploygamy' *(p. 550)*। তিনি বলিয়াছেন: ঋগ্বেদের ১০.১৪৫ সূক্ত এবং অথর্ববেদের ৩.১৮ মন্ত্র তাহার নিদর্শন। ১০.১৫৯ঋকে ইন্দ্রপত্নী শচী এবং ১.১০৫.৮-ঋকে ত্রিতের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। আপস্তম্বমন্ত্রপাঠ (১.১৬), তৈত্তিরীয়সংহিতা (৬.৬.৪.৩), ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (১২.১১), তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ (৩.৮.৪), শতপথব্রাহ্মণ (১৩.৪.১.৯) এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেও (৪৫.১-২, ২.৪.১) পুরুষের বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—'অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যবিভূবরী * *' (ঋক্° ১০.১৫৯.-

৫-৬), 'সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ' (ঋক্° ১.১০৫.৮); 'আদিৎপতিমকৃণুতং কনীনাম্' (ঋক্° ১০.১১৬১০); 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বন্দতে জন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতি বিন্দতে' (তৈত্তি° স° ৬.৬.৪.৩); 'তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দতে' তৈত্তি° স° ৬.৫.১০.৪); 'তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহপতয়ঃ' (ঐতরেয় ব্রা° ১২.১১); 'পত্নয়োহভ্যঞ্জন্তি। শ্রিয়া বা এতদ্রূপং যৎপত্নয়ঃ' (শতপথ ব্রা° ১৩.২০৬.৭); 'চতস্রো জায়া উপক্লৃপ্তা ভবন্তি মহিষী বাবাতা পরিবৃক্তা পালাগলী' (শতপথ ব্রা° ১৩.৪.১.৯) প্রভৃতি। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সত্যব্রত সামশ্রমী প্রণীত 'ঐতরেয়ালোচনম্' (পৃ° ৮৪-৮৫) দ্রষ্টব্য। সংহিতার যুগে পুরুষের পক্ষে যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা দেবলের এই: 'একা শূদ্রস্য বৈশ্যস্য দ্বে তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য চ। চতস্রো ব্রাহ্মণস্য স্যুর্ভার্যা রাজ্ঞো যথেচ্ছতঃ॥' প্রভৃতি বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই সামাজিক রীতিনীতি সকল যুগে একেবারে অপ্রচলিত অথবা সর্বদাই প্রচলিত ছিল এরূপ নয়, পরন্তু কম বা বেশী সময়ানুসারে ছিল ইহাই বলিতে হইবে।

একটি পতি থাকিতে নারীর পক্ষে বহুপতি নির্বাচনের রীতি ছিল। এসম্বন্ধে পঞ্চপাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী, সপ্তপতীসহচারিণী জটিলা গোতমীর উদাহরণ পাওয়া যায়। বার্কষীর নিদর্শনও অস্বীকার করা যায় না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'কথং তর্হি দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চপাণ্ডবা মারিষায়াশ্চ দশ প্রচেতসা * *' (আদি প° ১০৪.৩৫) ইত্যাদি আলোচনা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েই শূদ্রজাতিদের মধ্যে নারীরা দুই বা তিন জন পর্যন্ত পতি গ্রহণ করিত।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে অথর্ববেদের ৫.১৭.৮-৯ এবং ৯.৫.২৭-২৮ মন্ত্র-

গুলিই সুস্পষ্ট প্রমাণ। পণ্ডিত কানে এসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন: 'It must be admitted that remarriage of women was not prohibitcd in the time of the Atharvaveda' (*p. 615*)। অথর্ববেদের ৯.৫.২৭-২৮ মন্ত্রগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে: 'যা পূর্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দেতেঽপরম্। পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ॥ সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ। যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা-জ্যোতিষং দদাতি॥'—যে কোন নারী যদি প্রথম বিবাহের পর দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করেন, তবে পতি ও পত্নী উভয়েই পাঁচ সরা চাউলের সহিত একটি ছাগ কাহাকেও দান করিলে তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ বিচ্ছেদ হইবে না। পুনরায় দ্বিতীয় স্বামী ঐ পাঁচ সরা চাউলের সহিত একটি ছাগ ও কিছু মূল্য যদি কাহাকেও দান করেন তবে মৃত্যুর পর তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর সহিত তিনি একই লোকে গমন করিতে পারিবেন। অথর্ব° ৫.১৭.৮-৯ মন্ত্রগুলিতে বলা হইয়াছে: 'উত যৎ পতয়ো দশ স্ত্রিয়াঃ পূর্বে অব্রাহ্মণাঃ। ব্রহ্মা চেদ্ধস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকধা॥ ব্রাহ্মণ এব পতির্ন রাজন্যো ন বৈশ্যঃ। তৎ সূর্যঃ প্রব্রুবন্নেতি পঞ্চভ্যো মানবেভ্যঃ॥' —যদি কোন নারী প্রথমে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিবাহ করেন এবং সেই পতির মৃত্যুর পর পুনরায় ব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্রাহ্মণই তাহার প্রকৃত পতি। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৩.২.৪.৪) 'দৈধিষব্য' অর্থাৎ 'বিধবার পুত্র' শব্দেরও উল্লেখ আছে। পণ্ডিত কানে বলেন: 'The Grihyasutras are silent about remarriage; so probably by that time it had come to be prohibited generally, though sporadic instances might have occurred' (*p. 615*)। ঋগ্বেদে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে।

পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে আমরা 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে সামান্য আলোচনা করিয়াছি। পণ্ডিত কানে এসম্বন্ধে বলিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: বিবাহ সম্বন্ধে ১০'৮৫'৩৩ ঋকৃমন্ত্রে আমরা দেখি, নবপরিণীতা বধূকে দর্শন করিবার জন্য দর্শকগণ আগমন করিত। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে (১'৮'৭) উল্লিখিত আছে, নববধূ পতিগৃহে আসিবার কালে পথের মাঝে মাঝে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে দর্শন দান করিবার পূর্বে 'সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বিপরেতন ॥' (১০'৮৫'৩৩) এই ঋক্‌মন্ত্রটী আবৃত্তি করিতেন। পণ্ডিত কানে বলেন: 'This shows that veil was worn by the bride and she appeared in public without one. * * But in the Grihya and Dharmasustras there is no reference to any veil for women when moving in public' (*p. 597*)। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৩'২'৩৬) 'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও কেবলমাত্র রাজমহিষীদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে ১'৭'৩'১২) 'অন্তর্ধানং' বা 'পর্দা' কথায় উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু উহা 'পত্নীসংযাজ' নামক যাগের অংশ-বিশেষ; সোম, ত্বষ্টা ও দেবপত্নীগণ উহাতে যাগ করিতেন। দেবপত্নীগণের যাগের সময় গার্হপত্যাগ্নির পূর্বদিকে পর্দা দেওয়া হইত এবং তাহাতে পুরুষগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেবপত্নীগণ ভোজন করিতেন। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩'৭'১১) 'তৃতীয়েঽন্তর্ধানং পুরস্তাৎ' এবং ঐ শ্রৌতিবৃত্তিতেও 'তৃতীয়ে পত্নীসংবাকে কটাদিনা অন্তর্ধানং করোতীতি' কথাগুলির উল্লেখ আছে। উহা কিন্তু অবরোধপ্রথা নয়। তবে রামায়ণে (অযোধ্যাকাণ্ড ১১৬'২৮) উল্লেখ দেখা যায়: 'ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে। ন ক্রতৌ নো বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়ঃ।'

—দুর্ঘটনা, বিপদ, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে নারী যথেচ্ছ বা লোকসম্মুখে গমন করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে নারীদিগের পক্ষে আবার নিষেধেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ নির্দিষ্ট বিধিতে মাত্র 'দর্শনং ন দুষ্যতে' বলায় বিধিভিন্ন সময়ে অবশ্যই দূষণীয় ছিল বলা যায়।

সতীদাহ সম্বন্ধে 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে। পণ্ডিত কানে তাঁহার *History of Dharmasastras* (*pp. 624-636*) পুস্তকে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিকযুগে সতীদাহপ্রথা সম্বন্ধে পণ্ডিত কানে বলিয়াছেন: "There is no Vedic passage which can be cited as incontrovertibly referring to widow-burning as then current, nor is there any mantra which could be said to have repeated in very ancient times at such burning nor do the ancient Grihyasutras contain any direction prescribing the proceedure of widow-burning' (*p. 625*)। বৈদিক বা সূত্রযুগে সতীদাহপ্রথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এইজন্য কানে বলিয়াছেন: 'It therefore appears probable that the practice arose in Brahmanical India a few centuries before Christ' (*p. 625*).

নারায়ণীয়োপনিষদের ৮৪ অনুবাকে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয়সংহিতার ঔখ্যশাখায় যে মন্ত্রগুলি আছে তাহাকেই অনেকে সতীদাহের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মন্ত্রগুলি এই: "অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্ন্যানুগমব্রতঃ চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্। ইহ ত্বা অগ্নে নমসা বিধেম সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ।

জুষাণো অস্ত হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সন্ততো নয় মা পত্যুরগ্রে।"
পণ্ডিত কানে এই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'These, to say the least, are of doubtful authenticity' (*p. 625*)। মন্ত্রগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে আমরাও পণ্ডিত কানের সহিত একমত। শ্রদ্ধেয় কানে আরও বলিয়াছেন: 'None of the Dharmasastras except Vishnu contains any reference to *Sati*. The Manusmriti is entirely silent about it.' তবে মহাভারতের কালে কিন্তু সহমরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন: 'ত্বৈব্রেনং চিতাগ্নিস্থং মাদ্রী সমন্বারুরোহ' (আদি পর্ব ৯৫'৬৫); 'রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্। দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্যে প্রিয়ং কুরু' (আদি পর্ব ১২৫'২৯); 'সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাং পতিঃ' (বিরাট পর্ব ২৩'৮); 'পতিব্রতা সংপ্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনম্' (শান্তি পর্ব ১৪৮'১০) প্রভৃতি। ইহা ছাড়া মৌষলপর্বে (৭'১৮) দেখা যায়, বসুদেবের চারি পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী প্রভৃতি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের পর রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি পত্নীগণ চিতাগ্নিতে আরোহণ করেন এবং সত্যভামা তপস্যার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর গান্ধারীও স্বামীর অনুগমন করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মনীষী মোক্ষমূলার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অভিমতকে পণ্ডিত কানে ঠিকঠিক সমর্থন করিতে পারেন নাই। মোক্ষমূলার প্রভৃতির অভিমত 'হিন্দুনারী'-র পরিশিষ্টে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পণ্ডিত কানের মতে, কোন ব্রাহ্মণ বা স্মার্ত রঘুনন্দন 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিং অগ্রে' ঋগ্বেদের এই ১০'১৮'৭ মন্ত্রটীর স্থানে 'যোনিং অগ্নেঃ' শব্দ পরিবর্তন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন: 'But this charge is

not sustainable. That the verse Rig. X. 18. 7 as it actually is, was held to refer to widow burning centuries before Raghunandana * *' (*p. 634*)। পণ্ডিত কানের এই মন্তব্য কতটুকু সমীচীন তাহা অবশ্য বিচার্য বিষয়।

'হিন্দুনারী'-তে স্বামী অভেদানন্দ এই সমস্ত বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। 'হিন্দুনারী'-র অধিকাংশ উপাদান স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকা কালে বক্তৃতার আকারে দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পাশ্চাত্য জগতের সামনে ভারতীয় নারীজাতির অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রামাণ্য বর্ণনা মাত্র। 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (*India and Her People*) নাম দিয়া যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যগুলি 'ব্রুক্‌লিন ইন্‌ষ্টিটিউট'-এ (খৃঃ ১৯০৬) ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহারই মুখবন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন : 'My main object has been to give an impartial account of the facts from the standpoint of an unbiased historian, *and to remove all misunderstandings which prevail among the Americans concerning India and her people*' (*p. 5*)। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পাশ্চাত্যবাসীর নিকট ভারতের সভ্যতা, সমাজ ও শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অমূলক কলঙ্ককাহিনী স্তূপীকৃত হইয়াছিল স্বামী অভেদানন্দ তাহারই উচ্ছেদকারী মনীষাপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

'হিন্দুনারী' সম্বন্ধেও স্বামী অভেদানন্দের ঐ এক কথা। ভারতের কল্যাণকামী যেমন অনেকে আছেন, ভারতের দোষানুদর্শন করিবার লোকেরও সেরূপ অভাব নাই। খৃষ্টান মিশনারীরাই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্বে সুশিক্ষিত খৃষ্টান মিশনারীগণ ভারতীয় (হিন্দু) সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি

করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে তাহার গতি সামান্য প্রশমিত হইলেও স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মিলনে ভারতের বিজয়বাণী ঘোষণা করিলেন সেই দিনই খৃষ্টান মিশনারীদের প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান সুরু হইল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অন্যভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন: 'Since, the Parliament of Religions at the World's Fair in Chicago in 1893, the educated men and women of this country (America) have cast aside all such erroneous notion,'—সমগ্র পাশ্চাত্য নর-নারীর দৃষ্টি ভারতীয় আদর্শের প্রতি ধীরে ধীরে আবার আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের ও পাঞ্জাবে আর্যসমাজের কল্যাণ অভ্যুদয়ও সে সময়ে ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের পর পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য প্রতিকূলতা ও প্রশংসা এই দুইকে সমভাবে বরণ করিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ। ১৯০৬ সালে ভারতের হইয়া 'ভারতীয় সংস্কৃতি' *(India & Her People)* সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর সম্মুখে ভারতের প্রাচীনতা, মহত্ত্ব, গৌরব, ত্যাগ, তপস্যা, বিদ্যা, শিল্প, ভাস্কর্য, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা সকলকেই যখন তিনি মহান ও সমুন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন তখনই বলিতে হইবে তাহা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সমগ্র প্রাচ্য সভ্যতা ও গৌরবের মহিমময় দ্বিতীয় অভিযান। সমগ্র পাশ্চাত্য ধারণার জগতে ভারত সম্বন্ধে আবার নবজাগরণের স্রোত নূতন করিয়া তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, ভারতের উপকূলে আসিয়াও এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 'হিন্দুনারী'-র আসল উপাদানের পরিচয় সম্বন্ধে পৃথক করিয়া আর এখানে আমরা উল্লেখ করিব না। স্বামী অভেদানন্দের নির্ভীক ও জ্ঞানপ্রদ লেখনীর প্রত্যেকটি ছন্দই তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভাব সুপরিস্ফুট করিবে। পুস্তকের পাদটীকা ও পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিবার জন্য যে সব ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের গ্রন্থকারগণের নিকট আমরা বিনীতভাবে নিজেদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

হিন্দুধর্ম্মে নারী

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥[১]

যেখানে নারীজাতি সম্মানসহকারে অবস্থান করেন, সেই পরিবারের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হন। কিন্তু যেখানে তাঁহাদের সম্মান রক্ষিত হয় না সেইস্থানে সর্ববিধ পুণ্যকার্যানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়, তাহা কোনদিন সুফল প্রদান করিতে পারে না।

যে-পরিবারে নারীগণ অশান্তিতে দিন যাপন করেন সে-পরিবারের কোন-দিনই মঙ্গল হয় না, বরং তাহা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু যেখানে নারীরা সুখে অবস্থান করেন, এবং যে-সংসার তাঁহাদিগকে পবিত্র জানিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন, সে-সংসারের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্মে নারী

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার লুই জ্যাকোলিও (Louis Jaccoliot) তাঁহার 'ভারতে বাইবেল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

'India of the Vedas entertained a respect for women, amounting to worship ; a fact which we seem little to suspect in Europe when we accuse the extreme East of having denied the dignity of woman, and of having only made of her an instrument of pleasure and of passive obedience.'[১]

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষ নারীজাতির প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিত তাহা পূজার অনুরূপ। ইউরোপবাসী আমরা কিন্তু এ-কথা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করি না, কেবল অযথাই সুদূর প্রাচ্যবাসীদের উপর এই বলিয়া দোষারোপ করি যে, নারীজাতির সম্মানকে তাঁহারা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই, বরং নারীকে আপনাদের উপভোগের সামগ্রী ও অসহায়া দাসীরূপে পরিণত করিয়াছেন।

ইউরোপের অধিবাসীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন :

'What! here is a civilization which you cannot deny to be older than your own, which places the woman on a level with the man, gives them an equal place in the family and in society.'[২]

কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়! এই ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার তোমাদের উপায় নাই। কি পরিবারে, কি সমাজে একমাত্র ভারতীয় সভ্যতাই নারীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছে।

একদিকে মানব-সভ্যতার অরুণালোক যেমন সর্বপ্রথম ভারতের দিক্‌চক্রকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিয়াছিল, অপর-দিকে তেমনি ভারতই ধর্মসাধনার সর্বোচ্চ আদর্শকে উপলব্ধির দ্বারা বিবিধ দর্শন ও বহু নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া লোকসমাজে তাহা প্রচার করিয়াছিল। সেই গৌরবের স্বর্ণযুগে ভারতবর্ষই ছিল প্রকৃত নৈতিক চরিত্র, ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন আর্যজাতির বাসভূমি, আর তাহার বহির্ভূত দেশগুলিতে অসভ্য জাতি ও অনার্য-আচারে তখনও কিন্তু সমাচ্ছন্ন ছিল।

তাহার পর ইউরোপ ও আমেরিকার রাজবিধির অন্তর্গত আইনগুলি রোম্যান সম্রাট জাষ্টিনিয়ান[৩] প্রণয়ন করিবার বহু শতাব্দী পূর্বে—এমন কি সেমিটিক (Semitic) জাতিদের আইন-প্রণেতা মোজেসও (Moses) জন্মগ্রহণ

করিবার পূর্বে মহর্ষি মনু-প্রণীত সমাজবিধি ও রাষ্ট্রীয় আইন-গুলি ভারতের হিন্দুজাতিরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিত। জাষ্টিনিয়ানের রাজবিধি অথবা ওল্ড টেষ্টামেণ্টে (Old Testament) বর্ণিত মোজেসের নিয়মাবলীর সহিত মহর্ষি মনুর সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার তুলনা করিয়া বহু প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও (Orientalists) স্বীকার করিয়াছেন যে, মনু-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার সহিত পাশ্চাত্য বিধি-ব্যবস্থাসমূহের ব্যবধান পিতা-পুত্রতুল্য, অর্থাৎ ভারতে মনু-প্রণীত স্মৃতির নিয়মপ্রণালী বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ। যে-নৈতিক নিয়মাবলী হিন্দুগণ প্রাচীনকালে বিধিবদ্ধ করিয়া-ছিলেন, পরবর্তী যুগের হিন্দুরা সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি ও গ্রন্থাকারে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। বৈদিক যুগের সংহিতাকারগণের অনুশাসনকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী-কালের হিন্দুস্মার্তগণ পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

> দ্বিধা কৃত্বাত্মানোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
> অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥[৪]

সকল জীবের আদিস্রষ্টা ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর সৃষ্টির সময়ে আপনাকে পুরুষ ও নারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া-উভয়ের পরস্পরের মিলনে বিরাট্ নামক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন।[৫]

বেদ এবং পুরাণের এই দৃষ্টান্ত প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের মনে পুরুষ ও নারীর সাম্যভাবের মূলনীতিকে জাগ্রত করিয়াছিল। একটি ফলকে দুইভাগ করিলে তাহার প্রত্যেক অর্ধাংশে যেমন একই প্রকার স্বাদ ও গুণ বর্তমান থাকে সেইপ্রকার একই বস্তুর (তত্ত্বের) দুই অংশস্বরূপ পুরুষ ও নারীর মধ্যে একই অধিকার, বিশেষত্ব ও শক্তি বিদ্যমান। পুরুষ ও নারীর মধ্যে মূলতঃ এই একত্বের (সমতার) ভাবই হিন্দুধর্মের সুবিপুল সৌধের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া কালের ধ্বংসকারী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং সংকীর্ণদৃষ্টি সমালোচকগণের অযথা নিন্দাকে উপেক্ষা করিয়া এখনও তাই বহু শতাব্দীর পর ইহা পূর্ববৎ সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে। আর সেই কারণে ভারতবর্ষে পুরুষ ও নারীর দাবী সমান বলিয়া বিবেচিত—হিন্দুদের সামাজিক, নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষ ও নারীর প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় না। ঋগ্বেদেও এই অপক্ষপাতিত্বের ভাব সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে দেখা যায়। যথা,

উতধানেমোঅস্তুতঃ পুমাঁ ইতিব্রুবেপণিঃ।
সবৈরদেয়ইৎসমঃ ॥৬

ভাষ্যকার সায়ণও ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

'* * নেমঃ অর্ধঃজায়াপত্যোর্মিলিত্বৈককার্যকর্তৃত্বাদেক এব পদার্থঃ

অর্ধশরীরস্থ ভার্যেত্যাদিস্মৃতেঃ শশীয়স্যা-অর্ধভূতস্তরস্তঃ পুমান্ অস্তুত ইতি ব্রুবে বহুধা স্তুতোপি গুণস্যাতিবাহুল্যাদস্তুত এবেতি ব্রুবে পণিঃ স্তোতাহং স চ তরস্তোবৈরদেয়ে বীরাধনানাং প্রেরয়িতারোদানশীলাঃ তৈর্দাতব্যং ধনং দেয়ং তস্মিন্ধনে সমঃ সর্বেভ্যোদাতেত্যর্থঃ ইর্দিতিপূরণঃ।'

ইহার মর্মাংশ এই যে, স্বামী ও স্ত্রী সেই একই বস্তুর সমান অর্ধাংশ বলিয়া সর্বতোভাবে সমান ; সুতরাং তাঁহারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় ব্যাপারে পরস্পরে সমান অংশ গ্রহণ করিবেন।

হিন্দুজাতির পবিত্র গ্রন্থ বেদে যেভাবে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে তাহা আদৌ দেখা যায় না।

ওল্ড টেষ্টামেণ্ট (Old Testament), কোরাণ, জেন্দাবস্তা (পারসীকদের ধর্মশাস্ত্র) প্রভৃতিতে দেখা যায়, পুরুষের সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নারীর উৎপত্তি ও মানবের অধঃপতন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে গিয়া ওল্ড টেষ্টামেণ্ট পরিষ্কারভাবে বলিয়াছে যে, পুরুষের ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি, পুরুষের সকল আদেশ সুতরাং নির্বিচারে পালন করাই নারীর কর্তব্য। তাহার পর যে-প্রথমসৃষ্ট মানব আদম (Adam) স্বর্গে থাকিয়া দিব্যসুখ ভোগ করিত সেই

মানবকেও প্রলুব্ধ এবং অধঃপতিত করিয়াছিল নারী—যদিও শয়তানই সেই নারীকে তাহার যন্ত্রপুত্তলিকার মত পরিচালনা করিয়াছিল। সেই সময়ে আদমও স্থির করিয়াছিল যে, তাহার নিজস্ব অপরাধের ভার স্বীয় স্ত্রী ইভের (Eve) উপরই চাপাইয়া দিবে।[৭] বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament) এবং খৃষ্টানধর্মের সর্বপ্রধান প্রচারক সেণ্ট পলও (St. Paul) উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদমের স্বর্গ-বিচ্যুতির ব্যাপার হইতেই সমগ্র সংসারে পাপ, যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু প্রভৃতি আসিয়া জুটিয়াছে এবং নারীই তাহার কারণ।[৮] সম্প্রতি এই মনোভাবকে খৃষ্টধর্ম হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য খৃষ্টান প্রচারকদের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সে-চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই, বরং নারীজাতির প্রতি স্তুতিবাদের পশ্চাতে সেই অবজ্ঞাসূচক আদিম মনোভাব তাঁহাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, বাইবেলের আদিম পুস্তকে (*Genesis*) বর্ণিত পুরুষের অধঃপতনের এবং পৃথিবীতে দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ নারী—ইহা প্রথমে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আবার অস্বীকার করা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কারণ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তির পক্ষে দেখা যায়, বাইবেলে বর্ণিত আখ্যান একবার বিশ্বাস করিলে অন্য কোন বিষয় আর তিনি গ্রহণ করিতে চান না।

হিন্দুধর্মে নারী

বৈদিক যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনে নারীজাতির প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক ভাব কখনও উদিত হয় নাই; অথবা বেদের পরবর্তী কালে রচিত হিন্দু-স্মৃতিশাস্ত্রেও সেই জাতীয় কোন অশ্রদ্ধার ভাব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ হিন্দু-স্মৃতিকারগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ও নারী মূলতঃ এক, জ্ঞান, শিক্ষা ও ধর্মলাভ বিষয়ে তাঁহাদের অধিকার সমান ও স্বাধীন। জগতের নিকট ইহা তাঁহারা ঘোষণাও করিয়াছিলেন, আর এজন্যই ভারতের ইতিহাসে অধ্যাত্মভাবসম্পন্না ও তত্ত্বদ্রষ্ট্রী বহু নারীঋষির নামের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। দিব্যভাবাপন্না সেই নারীগণ সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই ধর্মোপদেশকারিণী, ভবিষ্যদ্বক্ত্রী এবং বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্ট্রীরূপে পুরুষ-ঋষিদের ন্যায় সমান শক্তিসম্পন্না বলিয়া সম্মানিতা হইতেন। সুতরাং 'হিন্দু-নারীদের পক্ষে বেদপাঠ ও ধর্মসাধনা নিষিদ্ধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস যাঁহারা পোষণ করেন আমরা তাঁহাদের ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত ষড়বিংশতম সুক্তটী যিনি স্বীয় দিব্যদৃষ্টি দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই হিন্দুনারীর নাম রোমশা।[১] লোপামুদ্রা নামক আর একজন দিব্যভাব-সম্পন্না হিন্দুনারীও আবার ঐ ঋগ্বেদের একশত উন-অশীতিতম

সূক্তটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন।[১০] এরূপ বহু নারীঋষির কথাই আমরা উল্লেখ করিতে পারি।[১১]

দৃষ্টান্তস্বরূপে অদিতির কথা এখানে বলা যাইতে পারে। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, ঘোষা প্রভৃতি অনেক অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্না বিদুষী নারীঋষিও সেই সময়ে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১২] সাংসারিক সকল ব্যাপারে হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া তাঁহারা সকলেই আধ্যাত্মি-কতার সুমহান্ আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে পরিস্ফুট ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেন, এজন্য সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের নাম 'ব্রহ্মবাদিনী'। যাবতীয় যজ্ঞকার্যের অনুষ্ঠান, বেদমন্ত্র গান, জন্মমৃত্যুসমস্যার সমাধান, আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় এবং তাহাদের পারস্পরিক নিগূঢ় সম্বন্ধের আবিষ্কার প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। বিভিন্ন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারশীল প্রবল প্রতি-পক্ষগণকেও তাঁহারা পরাস্ত করিতেন।

বেদের দার্শনিকভাগ উপনিষদ্‌গুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, বৈদিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গী ও মৈত্রেয়ী দুই নারীঋষির ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে কী গভীর বিচারই না হইয়াছিল![১৩]

এই সব দার্শনিক বিচারের সভায় নারীরাই যে আবার মধ্যস্থা হইতেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈত বেদান্তের সুবিখ্যাত ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর যখন মণ্ডনমিশ্রের সহিত দর্শন সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন তখন মণ্ডনমিশ্রেরই বিদুষী এবং সর্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী পত্নী উভয় ভারতী আহূত হইয়া সেই বিচারের সভায় মধ্যস্থার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এই সকল প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ-সত্ত্বেও যদি খৃষ্টান মিশনারীরা প্রচার করিতে থাকেন, বেদ-অধ্যয়নের অথবা ধর্মসাধনার বিষয়ে হিন্দুনারীদের অধিকার চিরনিষিদ্ধ ছিল তাহা হইলে এই বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই যে, খৃষ্টান মিশনারীরা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে কিছু সত্য দেখিতে চান না বা দেখিবার অবসর বোধ হয় পান না।

বেদে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে না লইয়া কখনও কোন যাগযজ্ঞপূজাদি অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না এবং একত্রে যজ্ঞাদি না করিলে নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ হইবে। হিন্দু-ধর্মে বিবাহিতা পত্নীকে সর্বতোভাবেই পতির ধর্মজীবনের সহায়িকা ও সহচারিণীরূপে মনে করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীর অপর নাম এজন্য 'সহধর্মিণী', অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর

ধর্মসাধনায় সাহায্যকারিণী। এই ভাব হিন্দুজাতির যথার্থই মজ্জাগত, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ইহা তাঁহাদের ভিতর সমভাবে রহিয়াছে। তবে একথাও আবার সত্য যে, ধর্মানুষ্ঠান বা বেদের কোন কোন অংশ পাঠ করা স্ত্রীলোকদের পক্ষে হয়তো তখন নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এ-নিষেধ শুধু তাঁহাদের জন্যই ছিল না, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসমর্থ পুরুষদের পক্ষেও বিধিবদ্ধ ছিল।

বেদের পর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেও আমরা দেখি, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সর্বদাই বজায় রাখা হইয়াছে। রামায়ণ মহাকাব্য যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এ-কাব্যের সুমহান্ নারীচরিত্র সাধ্বী সীতার জীবন কী আদর্শস্বরূপই না ছিল! সীতা ছিলেন সতীত্ব, পবিত্রতা ও করুণার যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং ধর্মের ভাবঘন সচল বিগ্রহ! আজও পর্যন্ত তাই সকল শ্রেণীর হিন্দুনারীরা সীতাকে তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। সমগ্র পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে দ্বিতীয় সীতার উদাহরণ সত্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সীতার অপার্থিব চরিত্র অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়! খৃষ্টানদের নিকট যীশুখৃষ্ট যেরূপ চিরপূজ্য, সীতাও সেরূপ জগতের ঈশ্বরী বলিয়া হিন্দুদের নিকট চিরপূজিতা। পুরুষদেহের ন্যায় নারীশরীরেও

ঈশ্বরকে অবতার বলিয়া দর্শন করা একমাত্র ভারতবর্ষের লোকেদের মধ্যেই দেখা যায়।[১৪]

মহাভারতে রাজর্ষি জনকের রাজসভায় মহাযোগিনী সুলভার যোগশক্তি ও দিব্যজ্ঞানের পরিচয়ের কথাও আমরা পড়িয়া থাকি। এই ঘটনাই আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ যে, ভারতের নারীরাও যোগসাধনার অধিকার পাইতেন এবং আজ পর্যন্তও সেইজন্য ভারতে উন্নত ধর্মভাবাপন্ন বহু সিদ্ধ-যোগিনীকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিদ্ধযোগিনীদের অনেকেই আবার বহু সাধক পুরুষের ধর্মশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ভৈরবী যোগেশ্বরী নামে একজন সিদ্ধা যোগিনীকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন।

শুধু ধর্ম-ব্যাপারেই নয়, প্রাচীন যুগের হিন্দুনারীরা বৈষয়িক ব্যাপারেও পুরুষদের সহিত সকল প্রকার সুবিধা ও সমান অধিকার ভোগ করিতেন।[১৫] প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও বিষয়সম্পত্তির অধিকার পাইবার সমান সত্ত্ব রহিয়াছে দেখা যায়। বিষয়-সম্পত্তিসম্বন্ধে বিচারের জন্য হিন্দুনারীরাও আদালতে যাইতেন এবং নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন।

ইংরাজ মহাকবি শেক্সপীয়রের (William Shakespeare)

রচনাবলীর ন্যায় ভারতীয় মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নামক অপূর্ব সংস্কৃত নাটকটিও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক প্রকৃতিসম্পন্ন ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই সুপাঠ্য নাটকের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, শকুন্তলা নিজের বৈষয়িক অধিকার পাইবার জন্য কি ভাবে সম্রাট দুষ্মন্তের রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

হিন্দুজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক শত আট সংখ্যক মন্ত্রও নারীজাতির গৌরবের একটী নিদর্শন।[১৬] যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুই হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুনারীরা যে রণক্ষেত্রে যাইয়া সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিত ইতিহাস হইতেও তাহা জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে মহাপরাক্রমশালিনী বীরনারী সরমার উদাহরণ সত্যই অপূর্ব। সাধ্বী সরমা তাঁহার পতির আদেশে প্রবল দস্যুদের অনুসরণ করিয়া তাহাদের গুপ্ত বাসস্থান আবিষ্কার করেন এবং অবশেষে তাহাদের নিহত করিয়াছিলেন।

ঋক্-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলেও এরূপ আর একটী অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজা নমুচির আদেশে তাঁহার বীর পত্নী সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র-ব্যাপারে ভারতীয় নারীরা যে, উচ্চাধিকার লাভ করিতেন, রাজ্য পরিচালনা করিতেন, আইন প্রণয়ন এবং বিচার-

কার্যাদির ভার গ্রহণ করিয়া ভারতের গৌরবকে মহিমময় করিয়া গিয়াছেন তাহার অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে।

সেযুগে নারীরা আপন আপন শাসনকার্যাদিও পরিচালনা করিতেন। পরবর্তী যুগে ভারতীয় বীর নারীগণ বৈদেশিক শত্রুদের আক্রমণকেও যে অসীম সাহসে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন সেরূপ কাহিনীও ইতিহাসে বিরল নয়। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা ভারত এখনও ভুলে নাই। মহাতেজস্বিনী এই নারী ব্রিটিশরাজ্যের একটী বিরাট সৈন্যবাহিনীকে বীরবিক্রমে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে সেই অসাধারণ সংগ্রামনৈপুণ্যের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন লিখিত থাকিবে। নারী হইলেও তিনি সেনানায়কের ন্যায় রণবেশ পরিধান করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বীর নারী রণক্ষেত্রেই জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন।[১৭] কিন্তু এমনই অমিত সাহসে ও বীরবিক্রমে তিনি যুদ্ধ এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশপক্ষের স্যর হিউ রোজ্ (Sir Hugh Rose) পর্যন্ত তাঁহাকে পুরুষসিংহ বলিয়াই ভুল করিয়াছিলেন, তিনি যে ঝাঁসির গৌরবময়ী মহারাণী ইহা আদৌ বুঝিতেই পারেন নাই।[১৮]

বেশী দিনের কথা নহে, ইহা ছাড়া আরও একটী গৌরবময়

দৃষ্টান্তের কথা আমাদের মনে পড়ে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাতিয়ালা রাজ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে সমগ্র শাসনকার্য্যে একবার বিশৃঙ্খলা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া আউস্ কাউর্ নামক একজন হিন্দুনারীকে সেখানকার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও তাঁহাকে সুযোগ্যা শাসন-পরিচালনকারিণী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সত্যই সেই মহিয়সী নারীর অসামান্য দক্ষতার গুণে এক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পাতিয়ালা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। মালবের (ইন্দোর) রাণী অহল্যাবাইও প্রাতঃস্মরণীয়া। অহল্যাবাই প্রজাপুঞ্জের স্বার্থরক্ষা এবং সর্বতোভাবে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য দীর্ঘ কুড়িবৎসর কাল সাফল্যের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি এমনই উদার প্রকৃতিসম্পন্না ও লোকপ্রিয়া ছিলেন যে, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই একযোগে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিত। সুনাম ও যশোলিপ্সা তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। একটী ঘটনার কথা মনে পড়ে, কোনও একজন লেখক তাঁহারই স্তুতি-প্রশংসাপূর্ণ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহাকে একবার উপহার দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং গ্রন্থকারেরও আর কখনও কোন খোঁজ-খবর রাখেন নাই।

এদিকে আবার দেখি, আমেরিকাবাসীরা নিজ সভ্যতা এবং নারীজাতির স্বাধীনতা লইয়াও বিশেষ গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, ভারতের তুলনায় সেখানকার নারীদের সে-অধিকার ও ক্ষমতা অতি সামান্য! তবে ইহাও সত্য যে, সেজন্য দোষী তাঁহারা অনেকটা নিজেও নন, বাইবেলই (Bible) বরং দায়ী; বাইবেলই তাঁহাদের নারীজাতির কলঙ্কের কথা শিক্ষা দিয়াছে—নারীজাতির প্রতি বাইবেলের ধারণাই তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।[১৯]

অনেকের আবার ধারণা যে, খৃষ্টধর্ম নারীজাতিকে সমুন্নত করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে আমরা পাই যে, খৃষ্ট-ধর্ম বরং বহুশতাব্দী ধরিয়া নারীজাতির আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। যেমন, নারীজাতির উন্নতিবিধানের জন্য আমেরিকায় যে-সকল সংঘ বা সমিতি (Suffrage Society) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির কথাই ধরা যাক্। সেখানে নিজেদের উন্নতি ও সমাজে অধিকার লাভের জন্য নারীদের কী পরিশ্রম সহকারেই না সংগ্রাম করিতে হইতেছে! মিসেস্ এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যাণ্টন্ (Mrs. Elizabeth Cady Stanton) নিউইয়র্কের (New York) সুবিখ্যাত ধর্মযাজক বিশপ পটারকে (Bishop Potter) এ-বিষয়ে (১৫ই

জানুয়ারী ১৭০১ খৃষ্টাব্দ) যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই আমেরিকার নারীদের অবস্থাসম্বন্ধে বেশ কিছু জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,

'সেদিন প্যাটারসন (Paterson) সহরে যে দুষ্কর্মের ও নারী-নির্যাতনের নির্লজ্জ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে সেরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় না। আমাদের সহরের রাজপথগুলিতে কোনও অমানুষিক পাপকার্য ঘটিলে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া যদিও তাহা দমন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি দেখা যায়, একস্থানে সাময়িকভাবে তাহা প্রশমিত হইলেও অন্যস্থানে তখনই আবার তাহা নূতনভাবে ঘটিতে থাকে। কখনও কখনও খৃষ্টীয় ধর্মযাজক সম্প্রদায় সে-সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেও ইহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারিতেন না বলিয়াই মনে হয়।

'এপিস্কোপাল চার্চের (Episcopal Church) কর্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি এ-বিষয়ের প্রতিবিধানের জন্য একটু সজাগ হইয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ-সকল দুষ্কর্মের প্রতিকারের জন্য প্রথমেই নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা প্রয়োজন এবং তাঁহারা যাহাতে আত্মসম্মান বিষয়ে সচেতন হন তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার পর যুবকসম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া উচিত যেন তাঁহারাও নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান হন।

'খৃষ্টানদের গির্জা ও বাইবেলের সুশিক্ষার প্রভাবে নারীজাতিরা জনসাধারণের নিকট ক্রমশই যেন ফুটবলের ন্যায় খেলার সামগ্রীরূপে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন!

'যখন দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহানুষ্ঠানেও স্বামীর আজ্ঞাপালনই নারীদের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং পুরুষই নারীকে অপরের নিকট দান করিতে পারিবেন—নারী নন, তখনই প্রমাণিত হইয়াছে যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন ও পুরুষেরই সম্পূর্ণ অধীন।

'যে-পর্যন্ত না নারীরাও আইন ও গির্জার নিয়মকানুনের সম্মুখে নিজেদের অধিকার প্রমাণ করিতে পারিবেন, যে-পর্যন্ত না বিশপ (Bishop), আর্চবিশপ (Arch-Bishop) ও এমনকি স্বয়ং পোপেরও (Pope) পর্যন্ত সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করিতে তাঁহারা না পারিতেছেন সে-পর্যন্ত সমাজের দুর্নীতি দূর করার সকল প্রকার চেষ্টাই আমাদের সুদূরপরাহত !

'প্রকাশ্য রাজপথে এবং পাপের গুপ্ত লীলাক্ষেত্রে নারীদের উপর যে-সকল জঘন্য অত্যাচার এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্য উচ্চপদস্থ ধর্মোপদেষ্টাগণের (নারীজাতির প্রতি) অশ্রদ্ধ মনোভাবই একমাত্র দায়ী। আমার মনে হয়, গীর্জা, বেদী, প্রতীক ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি যে-পরিমাণ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, দেশের মাতৃজাতির প্রতি ততটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিলেও এ-সমস্যার সমাধান শীঘ্রই হইতে পারে।

'সদাশয় যাজকসম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গ নারীদের উপর এ-ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের এজন্য একটী স্থায়ী কর্ম বা আন্দোলনের সৃষ্টি করা উচিত এবং তাহা হইলেই নারীরা সমাজে আবার শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সম্মান ফিরিয়া পাইবেন।

'নারীরা পুরুষের চেয়ে হীন এ-কথাও সর্বত্রই শিখান হয়। নারীজাতির বিড়ম্বনাময় এ-জীবনের বর্ত্তমান পরিণতির জন্য মনে হয়

আমরাই সকল দিক দিয়া এজন্য দায়ী ; তাঁহাদের অবনতি আমাদের জন্যই হইয়াছে।'

বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় আবার, রোমানদের আইন এবং স্মৃতিশাস্ত্রও (*Roman Law and Roman Jurisprudence*) পাশ্চাত্যে নারীজাতিকে যতটুকু উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিল, খৃষ্টধর্ম ততটুকুও পারে নাই এবং প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, খৃষ্টানজাতিই তথাকথিত পৌত্তলিক এই হিন্দুদের নিকট হইতে নরীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি টিউটনিক (Teutonic) জাতিরা বরং হিন্দুদের মতন পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বিষয়েই স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার বিশ্বাস করেন। তাঁহারা তাঁহাদের রাজা ও রাণীকে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানজাতিরা কিন্তু নর-নারীর সে-সমান অধিকারের মর্যাদাকে এখনও পর্যন্ত ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

তাহার পর দেখা যায়, খৃষ্টানদের আইনকানুনে বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনা করিবারও অধিকার নারীজাতিকে যতটুকু দেওয়া হইয়াছে হিন্দুআইন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অধিকার নারীদের দিয়াছে। ভারতে হিন্দুপরিবারে কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল প্রকার বিষয়েই এবং বিশেষ

করিয়া ব্যবসা-বণিজ্যব্যাপারে গৃহস্বামীরা নারীদের পরামর্শ ব্যতীত আবার কোন কার্যই করেন না।

পাশ্চাত্য দেশে আবার অনেকে বলেন শুনিয়াছি, হিন্দু-নারীরা তাঁহাদের স্বামীদের নিকট হইতে ক্রীতদাসীর মতই নির্দ্দয় ব্যবহার পাইয়া থাকেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।[২০] বরং একথা সত্য যে, ইংরাজ বা মার্কিনজাতি তাঁহাদের নারীদের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, হিন্দুনারীরা তাহা অপেক্ষা অধিকতর সদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহাদের স্বামীদের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য মনীষী স্যর মনিয়র্ মনিয়র্ উইলিয়ামস্‌ও (Sir M. M. Williams) সেকথা স্বীকার করিয়াছেন :

> 'Indian wives often possess greater influence than the wives of Europeans.'
>
> পাশ্চাত্য নারীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীদের অধিকার ও ক্ষমতা অনেক বেশী।

তাহার পর ইহাও সত্য যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার, প্রহার প্রভৃতি কলঙ্কময় ঘটনা ভারত অপেক্ষা য়ুরোপীয় ও আমেরিকার সমাজেই বরং বেশী দেখা যায়। ভারতে হিন্দুনারীর শরীরকে দেবতার মন্দিরের ন্যায় পবিত্র বলিয়া যিনি মনে না করেন তিনি প্রকৃত 'হিন্দু' নামেরই যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রদ্ধাবিহীন, ঘৃণা বা ক্রোধের বশবর্ত্তী

হইয়া যে-ব্যক্তি নারীর পবিত্র দেহকে স্পর্শ করেন তিনি ভারতীয় সমাজে জাতিচ্যুত। সংহিতাকারগণও বলিয়াছেন : 'নারীর গাত্রে কুসুমদ্বারাও আঘাত করিবে না।' এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে নারীদের প্রাণদণ্ডের পর্যন্ত ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক হিন্দুধর্ম নারীদের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাশীল এবং পবিত্র বলিয়া নারীদের মনে করে তাহার উদাহরণস্বরূপ মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের কয়েকটী নীতিবাক্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যেমন মনু বলেন :

নিত্যমাস্যাং শুচি স্ত্রীণাম্ * *।[২১]

নারীর মুখ চিরপবিত্র।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।

পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥[২]

পিতা, পতি, ভ্রাতা, দেবর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্যাণপ্রার্থী হইয়া নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং তাঁহাদের অলঙ্কারাদি প্রদান করিবেন।

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥[২৩]

যেখানে নারীরা সম্মানিতা হন সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। যেখানে নারীদের অসম্মান হয় সেখানে পুণ্যকর্ম পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই নিষ্ফল হয়।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥[২৪]

যে-পরিবারের নারীরা দুঃখে জীবন অতিবাহিত করেন সে-পরিবার সমূলে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে-পরিবারে নারীরা কোন কষ্ট পান না, কিন্তু সুখে থাকেন, তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হয়।

বশাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ ॥[২৫]

যে-সকল নারী নিঃসন্তান, যাঁহাদের আপনার বলিয়া সংসারে কেহ নাই, যাঁহারা পতিব্রতা, বিধবা এবং রোগাক্রান্তা তাঁহাদের সকলকেই রক্ষা করা উচিত।

জীবন্তীনাস্তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥[২৬]

যে-সকল আত্মীয় নারীদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লইয়া নিজেরা ভোগ করে, ন্যায়নিষ্ঠ রাজা সে-সকল ব্যক্তিকে চৌর্যাপরাধী হিসাবে অবশ্যই শাসন করিবেন।

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥[২৭]

যদি কোন নারীর আত্মীয়-স্বজনেরা কৌশল করিয়া তাঁহার ধন-সম্পদ, যানবাহন এবং বস্ত্র-অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া ভোগ করে তাহা হইলে সেই দুষ্কৃতাচারী আত্মীয়েরা অবশ্যই নিরয়গামী হইবে।

স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্মেণ ঘ্নন্ ন দুষ্যতি।[২৮]

নারী ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি কোন ব্যক্তি নরহত্যাও করিয়া ফেলেন তবে তাহাতে তাঁহার কোন পাপ হয় না।

* * * দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥[২৯]

কন্যা পিতার পরম স্নেহের পাত্রী ; এজন্য কন্যা যদি কোন অন্যায় কর্মও করিয়া ফেলে তবে পিতা তাহাকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া কিছু বলিবেন না।

এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হইবে না যে, খৃষ্টান মিশনারীরা আবার বলেন নাকি বালিকাহত্যাও হিন্দুধর্মের অনুমোদিত। মহর্ষি মনু কিন্তু এই উপরি উক্ত শ্লোকটীতে (৪ অ°, ১৮৫) তাহার যথার্থ উত্তরই প্রদান করিয়াছেন। মনুর এই শ্লোকটী পাঠ করিলে খৃষ্টান মিশনারীদের ঐ ভ্রম অবশ্যই দূরীভূত হইবে।

তাহার পর ভারতের সংহিতাকারগণ নারীমাত্রকেই সমগ্র হিন্দুসমাজের নিকট শ্রদ্ধার সামগ্রীরূপে প্রতিভাত করিয়া কিরূপ উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন তাহাও সত্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। আচার্য মনুই বলিয়াছেন ঃ

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্যয়া ॥[৩০]

মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি আত্মীয়া নারীগণকে গুরুপত্নীর ন্যায় ভক্তি করা মানুষমাত্রেরই কর্তব্য। তাঁহারা দীক্ষাগুরুর পত্নীর ন্যায়ই সমানভাবে পূজনীয়া।[৩১]

পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি ।
মাতৃবৎ বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥[৩২]

পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে স্বীয় জননীর ন্যায়ই ভক্তি করিবে। অবশ্য জননী ইঁহাদের সকলের অপেক্ষাই পূজনীয়া।

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥[৩৩]

সাধারণ শিক্ষক অপেক্ষা ধর্মগুরুকে দশগুণ অধিক ভক্তি করিবে, আচার্য অপেক্ষা পিতা শতগুণ অধিক শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণে পূজনীয়া।[৩৪]

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥[৩৫]

ব্রহ্মচারী ধার্মিক পুরুষের ন্যায় যে-সাধ্বী নারী তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়া ব্রহ্মচারিণীরূপে জীবনাতিপাত করেন, নিঃসন্তান হইলেও তিনি দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন করেন।

কিন্তু খৃষ্টান মিশনারিরা অনেকেই আবার বলেন শুনিয়াছি, হিন্দুধর্মানুসারে বিধবা নারীরা সমাজে অভিশপ্ত জাতি। এখানেও আমরা তাঁহাদের মহর্ষি মনুর এই 'মৃতে ভর্ত্তরি—' শ্লোকটীর অর্থ অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে নারীর স্থান হিন্দুসমাজে পবিত্র ও চিরউন্নতই করা হইয়াছে।

নারীজাতি সম্বন্ধে মহর্ষি মনু আরও উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন :

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥৩৬

যে-সংসারে পতি পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট এবং পত্নী পতির প্রতি স্বচ্ছন্দচিত্ত সে-সংসারে সুখ ও শান্তি বহুকাল স্থায়ী হয়।

অপত্যং ধর্ম্মকর্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধানস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥৩৭

সন্তান-সন্ততি, যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চনা সকল কিছু অনুষ্ঠান, একনিষ্ঠ সেবা, দাম্পত্য-জীবনের সর্বোচ্চ সুখ এবং পূর্বপুরুষগণের স্বর্গসুখ ও নিজের শান্তি স্বচ্ছন্দময় জীবন একমাত্র পত্নী হইতেই লাভ হয়।

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥৩৮

পতির পরদারবিমুখতা বা অন্য স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এবং পত্নীরও পাতিব্রত্যই দাম্পত্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরণকাল এই পবিত্র নীতি বা ধর্মাচরণই পতি ও পত্নীর একান্ত কর্তব্য।

নারীজাতি সম্বন্ধে অন্যান্য সংহিতাকারগণের নীতিবাক্যও এখানে উল্লিখিত এবং তাঁহাদের বঙ্গানুবাদমাত্রই দেওয়া হইল। যেমন,

১। নারীজাতি অসামান্য পবিত্রতার অধিকারিণী। তাঁহারা কখনই অপবিত্র হন না।

২। নারীর সর্বশরীরই পবিত্র।

৩। পুরুষই শৌর্য, নারীই সৌন্দর্য। পুরুষের বিশেষত্ব বিচারশক্তি, তাহার দ্বারাই তিনি সকল কিছু কর্ম পরিচালনা করেন, আর নারীর বৈশিষ্ট্য প্রজ্ঞা, তাহার দ্বারাই তিনি সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং পুরুষের বিচার-বুদ্ধিকে নিয়মিত করেন।

৪। নারীজাতিকে যিনি ঘৃণা করেন, বুঝিতে হইবে স্বীয় জননীকেই তিনি অবজ্ঞা করেন।

৫। নারীরা যাঁহার উপর রোষদৃষ্টিসম্পন্ন ঈশ্বরের নিকটও তিনি অভিশপ্ত।

৬। যে দুরদৃষ্টের ব্যবহারে নারীর চক্ষে অশ্রুপাত হয়, দেবতার রোষানলে সে ভস্মীভূত হয়।

৭। নারীর দুঃখ-কষ্টে যে-ব্যক্তি উপহাস করে সে-ব্যক্তির অকল্যাণ হয়। ঈশ্বরও তাঁহার প্রার্থনাকে অবজ্ঞা করেন।

৮। নারীকণ্ঠ বিনিঃসৃত ধর্মসঙ্গীত ঈশ্বরের কর্ণে পরম প্রীতিপ্রদ, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নারীর সহিত একসঙ্গেই পুরুষের প্রার্থনা করা উচিত।

৯। নারীকে অসহায়া জানিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করা ও তাঁহার পিতৃধন অপহরণ করা অপেক্ষা হীনতর পাপ আর নাই।

১০। নারী গৃহলক্ষ্মী, তাঁহার সান্নিধ্যে গৃহদেবতারা প্রসন্ন হন। কৃষিকর্ম প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমমূলক কাজ নারীকে করিতে দেওয়া উচিত নয়।

১১। যে-সকল আত্মীয় অসৎ উপায়ে অসহায়া নারীদের বিষয়-সম্পত্তি, যানবাহন ও অলঙ্কার-রত্নাদি অপহরণ করে তাহারা অবশ্যই নিরয়গামী হয়, তাহাদের কোন দিনই কল্যাণ হয় না।

১২। সচ্চরিত্রবান পুরুষেরা যেমন একবার মাত্র বিবাহ করেন ধর্মশীলা নারীরাও তেমনি একজন মাত্র স্বামীর অনুরাগিণী হইবেন।

মহাভারতেও নারীর পবিত্র আদর্শসম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,

সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা পতিব্রতা॥
অর্দ্ধং ভার্যা মনুষ্যস্য ভার্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সা ভার্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ম্বদাঃ।
পিতরো ধর্মকার্যেষু ভবন্ত্যার্তস্য মাতরঃ॥
কান্তারেষ্বাপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরাগতিঃ॥

সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিষমেষকপাতিনং।
ভার্যৈবান্বেতি ভর্তারং সততং যা পতিব্রতা॥
প্রথমং সংস্থিতা ভার্যা পতিং প্রেত্য প্রতীক্ষ্যতে।
পূর্বং মৃতঞ্চ ভর্তারং পশ্চাৎ সাধ্বনুগচ্ছতি॥
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতিভার্যামিহ লোকে পরত্র চ॥[৩৯]

যে-নারী গৃহকর্মে সুনিপুণা, সুসন্তানবতী, পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই যথার্থ পত্নী। পত্নীই তাঁহার স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সর্বশ্রেষ্ঠা বান্ধবী এবং স্বামীর ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পরিপূর্ণতা লাভের একমাত্র কারণ। গৃহস্থের চরম মুক্তিলাভের মূলে থাকেন সহধর্মিণী। যাঁহারা সুযোগ্যা শ্রীসম্পন্না পত্নীলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই সর্ববিধ কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিবার ও আদর্শ গৃহস্থ হইবার সুযোগ লাভ করেন, তাঁহারাই শান্তি ও ঐহিক উন্নতির অধিকারী হন। মানুষ যখন সংসারে একান্ত নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত, সেই দুঃসময়ে পত্নীই তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সঙ্গিনী। পত্নী মধুরভাষিণী এবং ধর্মসাধনায় তিনি পিতার ন্যায় স্বীয় পতির সহায়দাত্রী। স্বামী পীড়িত হইলে জননীর ন্যায় স্ত্রী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় রত হন। সংসার-অরণ্যের দুর্গম পথে পত্নীই মানুষকে বিশ্রাম দান করেন। নারীই প্রকৃতপক্ষে স্বামীর পরম সম্পদ।[৪০]

খৃষ্টান মিশনারীদের মতে হিন্দুদের সমস্ত সামাজিক নিয়মই অত্যন্ত বীভৎস ও দুর্নীতিপূর্ণ। কিন্তু ইহাও মিথ্যা নয় যে, ইউরোপের কোন কোন স্থানে নারীদের গরু ও

ঘোড়ার সহিত জোয়ালে জুড়িয়া শস্যক্ষেত কর্ষণ প্রভৃতি কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য করিতেও বাধ্য করা হয়।[৪১]

হিন্দুআইন (Hindu Law) অনুসারে ভারতে অবিবাহিতা কন্যাও মাতার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে (মনু° ৯·১৯২ দ্র°)। বিবাহের যৌতুকরূপে হিন্দুনারীরা যে বিশেষ ধন-সম্পত্তি লাভ করেন তাহাও কোন হিন্দু-স্বামী ভোগ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে কোন হিন্দুনারী তাঁহার পতি বা পুত্রের ঋণভার বহন করিতে বাধ্য নন। হিন্দুসমাজে পিতার ন্যায় মাতাও সন্তানের উপর সমান অধিকার দাবী করিতে পারেন।

মিসেস্ এফ. এ. ষ্টীল্ (Mrs. F. A. Steele) পঁচিশ বৎসরকাল ভারতে অতিবাহিত করিয়া ভারতের সামাজিক জীবন যাপন সম্বন্ধে কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

'In regard to the general position of women in India, I think it is rather better than our own. Women in India can hold property, and a widow always gets a fixed portion of her husband's estate.'

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে ভারতের হিন্দুনারীদের সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশের (পাশ্চাত্য) নারীদের অপেক্ষা অনেক ভাল। ভারতের নারীরা বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে

পারেন এবং প্রত্যেক হিন্দুবিধবা তাঁহার মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশবিশেষও প্রাপ্ত হন।

যে-সমস্ত সম্ভ্রান্ত আমেরিকান্ মহিলা খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেন না, কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে ভারতে বাস করিয়া এখানকার ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মিসেস্ ষ্টিলের উপর উক্ত কথাগুলি নিঃসন্দেহেই সমর্থন করেন। তবে সাধারণের ধারণা, হিন্দু-আইন অনুসারে বিধবাদের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থাই নাই। একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথাও এজন্য এখানে উল্লেখ করা গেল :

'In the absence of direct male heirs, widows succeed to a life-interest in real, and absolute interest in personal property. The daughters inherit absolutely. Where there are sons, mothers and daughters are entitled to shares, and wives hold peculiar property from a variety of sources over which a husband has no control during their lives, and which descend to their own heirs, with a preference to females.'[৪২]

কোনও পরিবারের সাক্ষাৎ পুরুষ উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকিলে হিন্দুবিধবারাই স্থাবর-সম্পত্তির আজীবন সত্ত্ব ও অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ সত্ত্বাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুকন্যাগণ

সম্পূর্ণভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। পুত্র বর্তমান থাকিলে মাতা ও কন্যা সম্পত্তির অংশবিশেষ পাইয়া থাকেন এবং পত্নীর জন্য নির্দিষ্ট সম্পত্তি 'স্ত্রী-ধন' সংরক্ষিত থাকে। এই 'স্ত্রী-ধন' কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর জীবদ্দশায় আদৌ ভোগ করিতে পারেন না, স্ত্রীর দেহত্যাগের পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সেই-সম্পত্তি পাইয়া থাকেন।

হিন্দুদের বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধেও পাশ্চাত্যদেশে বহু প্রকার অপবাদের কথা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া আমেরিকাতেই আমি উহার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তির কোলাহল শুনিয়াছি। তবে একথাও সত্য যে, পাশ্চাত্য-বাসীদের মধ্যে প্রচলিত 'কোর্টশিপ্'-প্রথায় (Courtship)** বিবাহকে হিন্দুরা আদৌ শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম পদ্ধতি বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের অভিমত এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। হিন্দুরা বলেন, এই প্রকার বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু স্বার্থলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করা। হিন্দুদের বিবাহ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের মতে 'ন বা * পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা * জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি' (বৃহ° উ° ২·৪·৫); অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্তি তাঁহাদের চক্ষে অতীব হেয়, আত্মার সহিত আত্মার মিলনের মহান্ আদর্শের উপরই

হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরাই সর্বপ্রথম আত্মায় আত্মায় মিলনের অবিচ্ছেদ্য পবিত্র সম্বন্ধরূপে বিবাহের মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মৃত্যুতেও সে-বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় না, অনন্তকাল ধরিয়াই দুইটী আত্মার সেই মধুর সম্পর্ক যে বর্তমান থাকে হিন্দুনারীরা এ-কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন; আর সেইজন্যই তাঁহারা পতির মৃত্যুর পর আর বিবাহ না করিয়া ধর্মজীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন।[৪৪]

মিসেস ষ্টিল্ (Mrs. Steele) বলেন :

'I have seen many a virgin widow who gloried in her fate.'

আমি বহু হিন্দু-বিধবাকে দেখিয়াছি তাঁহারা পবিত্রতা দ্বারা নিজেদের দুঃখময় জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ পবিত্র বৈধব্য জীবনযাপনই যেন তাঁহাদিগের নিকট মহাগৌরবের বস্তু।

হিন্দুসমাজে বিবাহকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হয় না। বিবাহ অপেক্ষাও যে এক মহত্তর উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা এই জীবনেই লাভ করা যায় হিন্দুরা একথা ভালভাবেই বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষের বিবাহপদ্ধতির সমগ্র আদর্শই তাই। পুরুষ ও নারীর শাস্ত্র বা আইন-

সঙ্গতভাবে পবিত্র মিলনের উপর ভারতীয় বিবাহপদ্ধতির আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতির সংরক্ষণ বা সমাজের সুবিধার জন্য কোন কোন স্থলে এ-নিয়মেরও আবার ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তনকেও হিন্দুরা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোথাও কোথাও স্বীকার করিয়া লন; যেমন কোন ব্যক্তির প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান হইলে বংশরক্ষার জন্য পত্নীর সম্মতি লইয়া স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারেন।[৪৫]

বাস্তবিক দেখা যায়, হিন্দু-সংহিতাকারগণের প্রতিনিয়ত লক্ষ্যই ছিল, এমন একটি পবিত্র সমাজ তাঁহারা গঠন করিবেন যেখানে বিধি বা আইনের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াও মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সক্রিয় ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমাজে তাঁহারা শ্রেণীবিভাগ করিয়া সেজন্য প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আবার স্বতন্ত্র বিধি-ব্যবস্থাও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ'—মানুষের রুচি বিচিত্র; সমাজশাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন লোকের রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী বিবাহবিধিরও বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। একই সামাজিক নিয়ম যে সকল মানুষের প্রকৃতির পক্ষে সমানভাবে অনুকূল নয় ইহা তাঁহারা ভালভাবে বুঝিতেন; সেজন্য যে-ব্যক্তি সমাজের যত উচ্চস্তরে থাকিবেন তাঁহার সম্বন্ধে সামাজিক নিয়মও তাঁহারা তত কঠোর করিয়া

গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়, যেমন একই সংহিতাকার ব্যবস্থা দিয়াছেন বিধবা-বিবাহের অনুকূলে নিম্নশ্রেণী লোকের জন্য, কিন্তু তাহা নিষেধ করিয়াছেন আবার অভিজাত বংশের পক্ষে।

নিম্নজাতির হিন্দুবিধবাদের অনেকে প্রায় স্বামীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে পারেন,[৪৬] কিন্তু এই পুনরায় বিবাহ করা কিম্বা না-করা সম্পূর্ণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। হিন্দুআইনে বিধবা এবং স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা নারীর পক্ষে যেরূপ পুনরায় বিবাহবিধির ব্যবস্থা আছে, বিপত্নীক বা পত্নীকর্তৃক পরিত্যক্ত পুরুষদিগের পক্ষেও সেরূপ ব্যবস্থা আছে।

কোন নারীর স্বামী রাজদ্বারে অভিযুক্ত, উন্মাদ, ক্লীব, সমাজচ্যুত অথবা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে সেই নারী যদি ইচ্ছা করেন তবে আইনের সহায়তায় স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-আইনমতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারেন। অথবা পতি যদি বহুকাল নিরুদ্দেশ থাকেন তাহা হইলে নারীগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন এরূপ বিধিও হিন্দুসমাজে আছে।[৪৭] রোমান-আইনেও (*Roman Law*) ঠিক তাই; বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে রোমান-আইনবিধিও হিন্দু-স্মৃতিকারগণের অনেকটা অনুরূপ।

হিন্দু-আইনে নারীজাতির ন্যায় পুরুষের সামাজিক

ব্যবস্থাও একরূপ। যেমন কোনও নারী সুরাপানে আসক্তা, ব্যভিচারিণী, কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, স্বামী ও সন্তানের প্রতি নির্দয়চিত্তা হইলে স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারেন।[৪৮] কিন্তু শুধু মনোমালিন্য বা খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া পুনরায় বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কাহারও বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবৃত্তিকে হিন্দুসমাজবিধি কখনও প্রশ্রয় দান করে না।

অনেকে বলেন, বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক জ্বলন্ত অভিশাপবিশেষ এবং হিন্দুধর্ম সেই অভিশাপকে বরণ করিয়া সমাজে পাপেরই প্রশ্রয় দান করে। কিন্তু এই-কথা সম্পূর্ণই অমূলক। হিন্দুধর্ম বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী কখনই নয়।[৪৯] তবে ভারতের বহু স্থানে বাল্যবিবাহ বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা বাগ্‌দানপ্রথা মাত্র। এই বাগ্‌দানপ্রথা প্রকৃত বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়; ইহা বিবাহের প্রতিশ্রুতি মাত্র, ঠিক ঠিক বিবাহ নয়। বিশেষ কোন কারণ থাকিলে এই বাগ্‌দানের পর প্রকৃত বিবাহের কাল তিন চারি বৎসর বর্ধিতও হইতে পারে।

উত্তর ভারতের রীতি অনুসারে বর ও কন্যা যতদিন না প্রাপ্তবয়স্ক হন ততদিন তাঁহাদের বিবাহের অনুষ্ঠান হয় না। সঙ্গীত, ভোজ ও নানা উপহার-সামগ্রীর সমাবেশে তাঁহাদের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে বাগ্‌দত্তা কন্যা

প্রকৃত বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন। দক্ষিণ ভারতের সামাজিক রীতি কিন্তু সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। সেখানে অল্পবয়স্কা বালিকাদেরও বিবাহ দেওয়া হয় এবং সমাজেও সেজন্য তাঁহাদের বিভিন্ন রকমের অনর্থ প্রবেশ করিয়াছে।

হিন্দুস্মৃতিমতে বাগ্‌দত্তা কন্যার স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার আর অপর ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইতে পারে না এবং তাহার পিতামাতারা এজন্য যদি আদালতে সেই বাগ্‌দানের কথা অস্বীকার করেন তবে সমাজে নিন্দনীয় হন।[৫০] হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্তবংশীয় নারীরা আবার চিরজীবন বরং অবিবাহিতা থাকিবেন তথাপি হীনবংশজাত, স্বগোত্রীয়, অযোগ্য এবং নিরক্ষর মূর্খ কোনও ব্যক্তিকে কখনও বিবাহ করেন না।[৫১]

হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের বর্ণনা ও আলোচনা আছে।[৫২] তাহার মধ্যে বর ও কন্যার পিতা-মাতার সম্মতি-লইয়া যে-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।[৫৩] ভাব-প্রবণতার বশে, ক্ষণিক ভালবাসার মোহবন্ধনে পড়িয়া যে-বিবাহ তাহা প্রশংসনীয় নয়, বরং নিন্দনীয়।[৫৪] প্রাচীন কালে হিন্দুরাজত্বকালে স্বয়ম্বরবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল।[৫৫] এই প্রথা অনুসারে নারীরা স্বাধীনভাবে আপনার মনোমত সুযোগ্য ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ করিতে পারিতেন। স্মার

এডুইন আরনল্ড্ (Sir Edwin Arnold) তাঁহার 'এসিয়ার আলোক' (*Light of Asia*) কাব্যগ্রন্থেও গৌতম বুদ্ধের বিবাহ বা স্বয়ম্বর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে এ-কথা সত্য যে, ভারতে মুসলমান-আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়া হিন্দুরা যখন পরাধীন হইলেন সেই সময়ে যদি এই স্বয়ম্বরপ্রথা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কখনই তাঁহারা বর্ণসঙ্করতা অথবা নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। সেই সময় হইতেই সে-জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে এই স্বয়ম্বরপ্রথা উঠিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে পুত্র-কন্যাদের সম্মতিসূচক বাগ্‌দানপ্রথা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য এই বাগ্‌দান প্রথা আবার ভারতের সর্বত্রই তখন প্রচলিত ছিল না।

খৃষ্টান মিশনারীরা আবার ভারতের হিন্দুনারীদের নৈতিক চরিত্রের উপরও অকারণে দোষারোপ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না এবং আরও দুঃখের বিষয় যে, আমাদের স্বদেশবাসিনী কোন কোন নারীও নাকি এই সকল মিশনারীদের সহিত যোগ দিয়া হিন্দুনারীদের পবিত্র চরিত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন। সত্যই ইহা পরিতাপের বিষয়! পাশ্চাত্যবাসীরা যদি প্রকৃতই ভারতীয় নারীদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগকে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারিত সকল প্রকার

উক্তির শতকরা নব্বুইটিকে একেবারে অসত্য বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। তবে একথাও কেহ স্বীকার করেন না যে, ভারতীয় হিন্দুসমাজের সমস্ত নারীই একেবারে অমার্জনীয় চরিত্রা, কিন্তু হিন্দুনারীদের মধ্যে সুচরিত্রা পবিত্র স্বভাবসম্পন্না নারী একেবারেই নাই এরূপ নির্জলা মিথ্যা কথাও কেবল জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয় কি ? ভারতীয় মহিলা পণ্ডিতা রমাবাই-এর উক্তিও অবশ্য তদনুরূপ। তিনিও ভারতীয় মহিলাদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন দেখিয়াছি :

> 'I would not trust one of my girls in any Indian home. The mmorality in that country is horrible !'৫৬
>
> আমি আমার কন্যাদের কাহাকেও কোন ভারতীয় পরিবারে রাখিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতের দুর্নীতি সত্যই বীভৎস !

পণ্ডিতা রমাবাই খৃষ্টধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি আমাদের স্বদেশবাসিনী এবং সত্য যাহা কিছু সকলই জানেন ; সুতরাং তাঁহার এই বিজাতীয় মনোভাবসুলভ ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য যে ভারতবাসীমাত্রের প্রাণে বেদনাদায়ক হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে !

সতীদাহ

হিন্দুবিধবাদের চিতারোহণ বা সতীদাহ প্রথাও হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র কখনও অনুমোদন করে না।

তবে ঐঘটনা ভারতের ইতিহাসে ঘটিলেও শাস্ত্রবিধানের পরিবর্তে উহার পশ্চাতে যে অন্য কারণ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, মুসলমানেরা যখন ভারত আক্রমণ করিয়া একটীর পর একটী রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন তখন পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের পুরনারীদের উপর বিজয়ী মুসলমান সৈন্যগণের কেহ কেহ জঘন্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদেরই সেই অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রায় সমস্ত অসহায়া নারীরা স্বেচ্ছায় চিতাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিতে তখন বাধ্য হইতেন।[৫৮]

পাশ্চাত্যবাসীরা অনেকেই বলেন নাকি, সতীদাহের অমানুষিক নিষ্ঠুর প্রথা বৃটিশ সরকারই সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অতীব সত্য যে, সেই সতীদাহের পৈশাচিক প্রথার উচ্ছেদের মূলে অভিজাত হিন্দুবংশজাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ঋণও কেহ পরিশোধ করিতে পারিবে না। পরাধীন দেশ বলিয়াই রাজা রামমোহনকে অগত্যা বৃটিশ

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, সতীদাহ প্রথা ভারতের সর্বত্র তখন প্রচলিত ছিল না এবং কোন কোন স্থানে প্রচলিত থাকিলেও সর্বদা ও সর্বত্র তাহা বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তাহার পর যে-সকল স্বার্থাভিলাষী ব্যক্তিগণ সেই নিষ্ঠুর প্রথার প্রশ্রয় দিতেন শিক্ষিত হিন্দুসমাজের নিকট তাঁহারা নিন্দনীয় ও প্রতিবাদভাজনই বরং হইতেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ হইতে জোর করিয়া এই অমানুষিক প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা বহু পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তবে হিন্দুরা যখন দেখিলেন বিদেশী সরকারের আইনের সাহায্য ব্যতীত তাহা উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য নয় তখনই তাঁহারা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের (Lord Bentinck) নিকট আবেদন করিয়া এবং প্রচণ্ড আন্দোলন চালাইয়া সেই প্রথা উঠাইয়া দিবার পক্ষে আইন পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের আইন সেই কার্যে সহায়ক হইলেও প্রধানতঃ তাহার মূলে যে একমাত্র হিন্দুদের ঐকান্তিক ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা এবং পরিশ্রমই বর্তমান ছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।"[১]

স্যর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্‌ও (Sir M. M. Williams) স্বীকার করিয়াছেন :

'It was principally his (Raja Rama Mohan Roy's) vehement denunciation of this practice, and the agitation against it set on foot by him, which ultimately led to the abolition of *Sati* throughout British India in 1829.'[৬০]

এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রধানতঃ রাজা রামমোহন রায়ের প্রচণ্ড প্রতিবাদের ও তাঁহার প্রবর্তিত প্রবল আন্দোলনের ফলেই অবশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইয়া যায়।

নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ভারতের কোন কোন স্থানে দেখা যায়, নারীগণকে পুরুষদের সহিত অবাধ মেলামেশা করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম সেজন্য দায়ী নয়। ইহার অন্য কারণ রহিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে কোথাও কোথাও তাঁহাদের অত্যাচার হইতে নারীদের রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সমাজে এই প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। নারীদের পর্দার আড়ালে রাখা, অবগুণ্ঠনপ্রথা, যেখানে সেখানে তাঁহাদের যাইতে না দেওয়া প্রভৃতি রীতির উদ্ভবের জন্য দেখিতে গেলে হিন্দুজাতি ঠিক দায়ী নন। মুসলমান আক্রমণ-কারীদের কোথাও কোথাও অত্যাচার ইহার কারণ। ভারতের বহুস্থানে আবার দেখা যায়, হিন্দুনারীরা পর্দানসীন

একেবারে নন, পুরুষদের সহিত তাঁহারা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করেন এবং একই গাড়ীতে ভ্রমণ করেন।[৬১]

স্যর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্‌ও সেজন্য উল্লেখ করিয়াছেন :

'Moreover, it must be noted that the seclusion and ignorance of women, which were once mainly due to the fear of the Mahommedan conquerors, do not exist in the same degree in provinces unaffected by those conquerors.'[৬২]

বেশীর ভাগ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, এক সময়ে মুসলমান বিজেতাগণের ভয়ের জন্যই হিন্দুনারীদের অবরোধপ্রথা ও অজ্ঞতার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেজন্যই দেখা যায়, ভারতের যে যে অংশের মুসলমান বিজেতাদের গতিবিধি ছিল না সেই সব স্থানের নারীদের মধ্যে শিক্ষাদৈন্য ও অবরোধপ্রথা তেমনভাবে দেখা যায় না।

হিন্দুজননীরা নাকি আপনাদের শিশু-সন্তানগণকে গঙ্গাগর্ভে কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করেন—খৃষ্টান মিশনারীদের এরূপ আর একটি মামুলি মিথ্যা প্রচারের কথাও অনেকে বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন।[৬৩] পাশ্চাত্যের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলিতেও আবার এমন সব ছবি অঙ্কিত থাকে যাহা দেখিলে সত্যই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহাদের

মধ্যে একটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া যেমন বলা যায়, কৃষ্ণকায়া কোনও জননী তাঁহার শ্বেতাঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া প্রকাণ্ড একটি হিংস্র কুম্ভীরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই কাহিনী ও চিত্র প্রভৃতির উদ্ভবের কারণ মনে হয় আর কিছুই নয় ভারতে কোন কোন স্থানে দরিদ্রা হিন্দুমহিলাগণ হয়তো নিজেদের মৃত শিশু-সন্তানদিগের সৎকারের ব্যয়ভার বহন করিতে না পারিয়া মৃতদেহগুলিকে গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন এবং তাহা হইতেই অবশেষে এই সমস্ত আজগুবি ও কল্পিত কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।[৩৪]

এইরূপ আর একটী মিথ্যা কাহিনী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধেও প্রচারিত হইয়াছে। সদাশয় খৃষ্টান পাদ্রীগণ ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মুক্তির পথপ্রদর্শন করিবার জন্য এতই উদ্গ্রীব ও অনুকম্পাশীল যে, অবশেষে তাঁহারা এইরূপ মিথ্যা কাহিনীও সৃষ্টি না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এই অলীক কাহিনীটী সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া মনীষী স্যর মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামস্ও (Sir Monier Monier Willams) স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন:

'It is usual for missonaries to speak with horror of the self-immolation alleged to take place under the car of Jaggannath. But, if

deaths occur, they must be accidental, as self-destruction is wholly opposed both to the letter and spirit of their religion.'[৬৫]

হিন্দুরা জগন্নাথদেবের রথের চাকার তলায় স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া আত্মহত্যা করে এরূপ ভীতিজনক কাহিনীর অবতারণা করা খৃষ্টান পাদরীদের নিত্য-নৈমিত্তিক বা অভ্যাসগত কার্য। তবে বাস্তবিকই যদি ঐরূপক্ষেত্রে কাহারও মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কেননা আত্মহত্যা হিন্দুধর্ম অনুসারে পাপ এবং হিন্দু শাস্ত্রের কোথায়ও এই প্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ নাই, বরং ইহাকে অত্যন্ত বিগর্হিত কর্ম বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

বাস্তবিক খৃষ্টান মিশনারীগণ মিথ্যা প্রচার করিয়া যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন সে সকলের এখানেই শেষ হয় নাই। তাঁহাদের আরও একটি অদ্ভুত উদ্ভাবনা এই যে, হিন্দুগণ নাকি তাঁহাদের ছোট ছোট শিশু-কন্যাদেরও হত্যা করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের ভারতেরই একজন বিদুষী মহিলা পণ্ডিতা রমাবাঈ আবার লিখিয়াছেন :

'Female infanticide, *though not sanctioned by religion and never looked upon as right* by conscientious people, has neveятheless, in

those parts of India mentioned been silently passed over unpunished by society in general.'৯৯

যদিও শিশু-কন্যাদের হত্যা করা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নয় এবং কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করে না, তথাপি ভারতের ঐ সকল স্থানে হিন্দুসমাজ ক্রমাগতই নীরব ও উদাসীন থাকিয়া তাহার কোনও শাস্তিবিধান করে নাই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পণ্ডিতা রমাবাঈ সম্ভবতঃ জানেন না যে, আমেরিকার নিউইয়র্ক ও অন্যান্য বড় বড় সহরের সদর রাস্তায় এবং নিভৃত স্থানে প্রতি বৎসর কত শত শিশুর মৃতদেহ সংগৃহীত হইয়া থাকে! তাঁহার জানা উচিত আমেরিকার সমাজ সেই সব দুষ্কৃতকারীদের প্রতি কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কিনা? আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায়, শিশু-কন্যা হত্যারূপ দুষ্কৃতির জন্য (যদিও ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক) হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ অপরাধী, তাহা হইলে ইহাও দাবী করা অসমীচীন হইবে না যে, আমেরিকার সমাজেও যেই সমস্ত অমানুষিক কার্য নিত্য-নূতনভাবে প্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার জন্য খৃষ্টান ধর্ম বা সমাজকেও দায়ী করা উচিত!

শিক্ষায় হিন্দুনারী

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও দেখা যায়, অভিজাত শ্রেণীর

হিন্দুনারীরা নিজ নিজ মাতৃভাষাতে সাধারণতঃ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন। লিখন পঠনও তাঁহারা মাতৃভাষাতে অভ্যাস করেন, অবশ্য কোনরূপ উপাধি লাভের জন্য পরীক্ষায় তাঁহারা যোগদান করেন না।[৬৭]

হিন্দুধর্ম ও সমাজ কোনদিনই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নয়, বরং উহার সমর্থনই চিরদিন করিয়া আসিয়াছে।[৬৮] এজন্য পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বামী সকলেরই তাঁহাদের কন্যা, ভগিনী ও পত্নীগণকে সর্বতোভাবে শিক্ষিতা করিয়া তোলা উচিত এবং ইহাই হিন্দুধর্মের আদর্শ ও শিক্ষা। তবে ইহাও সত্য যে, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি হিন্দুনারীদের মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার থাকিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দুধর্ম নয়।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বহু প্রতিভাশালিনী হিন্দুনারী ভারতে রহিয়াছেন। যে সাতজন প্রসিদ্ধ কবি দক্ষিণ-ভারতের মালাবার প্রদেশ গৌরবান্বিত করিয়াছেন আমরা শুনিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে চারিজনই ছিলেন নারী। ইঁহাদের মধ্যে 'অব্যার' নাম্নী একজন মহিলাকবির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত উচ্চ নীতিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়াছে। এই নীতিগাথাগুলি সত্যই মানব-জীবনের আদর্শস্থানীয়। মনীষী ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতীও গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্না একজন নারী

ছিলেন। ইঁহার প্রণীত গণিতশাস্ত্র (বীজগণিত বা Algebra) আজিও হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্বাচিত রহিয়াছে।

ধর্মসাধনায় হিন্দুনারী

খৃষ্টান মিশনারীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন নাকি, হিন্দু-ধর্মমতে নারীজাতির কোন আত্মা নাই এবং তাঁহারা মুক্তিরও কখন অধিকারিণী হন না। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, মিশনারীদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ কল্পিত ও মিথ্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা উপনিষদ্ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, আত্মা পুরুষও নন আবার স্ত্রীও নন, এবং নরনারীমাত্রেই শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক একদিন ধর্মসাধনার চরমলক্ষ্যে উপনীত হইবেনই।[৬৯]

একমাত্র হিন্দুধর্মই নারীকে ধর্মশিক্ষয়িত্রী হইবার এবং সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার গৌরবজনক অধিকার প্রদান করিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, বুদ্ধের ধাত্রীমাতা মহাপ্রজাপতি গোতমী বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুনীদের সঙ্ঘনায়িকার পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন।[৭০] ভারতে আজিও শত শত হিন্দু-সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগণ তাঁহা-দিগকে শিক্ষাদাত্রী ও আচার্যা বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া

থাকেন। তুষারশুভ্র নির্মলচরিত্রা ও আধ্যাত্মিক জ্যোতি-সমুজ্জ্বলা নারীগণকে হিন্দুরা কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন উনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্মনায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা ও উপলব্ধি করা হিন্দুধর্মের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।" ঈশ্বরের মাতৃভাবটি ভারতের হিন্দুরা যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তাহার প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ তাঁহাদের নিকট যেরূপ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, পৃথিবীর আর কোন ধর্মান্বেষী জাতির কাছে সেরূপ বোধগম্য ও প্রকাশিত হইয়া উঠে নাই। ইহা হইতেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, হিন্দুধর্মে নারীর স্থান গৌরবে ও সম্মানে কত সমুজ্জ্বল!

হিন্দুদের নিকট পার্থিব জননীও পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী। স্বয়ং ঈশ্বরকেও মূর্তিমতী জগজ্জননীরূপে না দেখিলে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা বলেন: 'সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে', অর্থাৎ পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণে গরীয়সী, আর সেজন্য হিন্দুগণ পরমপুরুষ পরমাত্মাকে পিতা অপেক্ষা মাতা বলিয়া ডাকিতে ও উপাসনা করিতে ভালবাসেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে কোন নারী বৃদ্ধাই হউন বা বালিকাই

হউন, তিনি জগজ্জননীরই প্রতিনিধিস্বরূপা।[১২] অন্যান্য ধর্মে যাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, মহামায়া তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মহামায়াই সর্বজীবের সৃষ্টিকর্তা সেই ব্রহ্মাকে প্রসব করেন।[১৩] সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ভিন্ন এমন আর কোনও দেশ নাই যেখানে প্রত্যেক জননীই সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ভক্তির অর্ঘ্য লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভারতে দেখা যায়, প্রত্যেক পল্লীতে এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন এবং স্নেহময়ী জননীরূপে তাঁহারা আপন আপন পল্লীর সন্তানবৃন্দকে সমস্ত আপদ-বিপদ ও অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। আর এই সর্বশক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক হিন্দুসাধকের হৃদয় হইতে আজিও এই প্রার্থনা-গীতি উৎসারিত হইতে শুনা যায়ঃ

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥[৭৪]

হে ভক্তদুঃখহারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। হে নিখিল-বিশ্বজননি, প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্ব প্রতিপালন করুন। হে দেবি, আপনি বিশ্বচরাচরের ঈশ্বরীস্বরূপিণী!

হে অপরাজেয়া শক্তিশালিনি, আপনি পৃথিবীরূপে সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপা, জলরূপে বিরাজিতা বলিয়া বিশ্বচরাচরকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। হে দেবি, এজন্যই আপনি সর্বাত্মিকা বিশ্ব-চরাচরের আধারভূতা!

হে দেবি, আপনি অনন্ত ও অপরিসীম বীর্যসম্পন্না এবং বিষ্ণুর জগৎপরিপালিনী শক্তি। বিশ্বের আপনি আদিকারণ পরমা মায়া। আপনি সমগ্র জগতকে আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত করিয়াছেন, আবার আপনি প্রসন্না হইলেই সংসারে সকলে পরমা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।[৭৫]

হে দেবি, বেদাদি সমস্ত বিদ্যা আপনারই অংশস্বরূপ। চতুঃষষ্টি

কলা, পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি গুণসমন্বিতা সকল নারীই আপনার প্রতিমূর্তি! জননীরূপা আপনিই একাকিনী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। হে আদ্যাশক্তি জননি, আপনি সকল কিছু স্তব ও স্তুতির অতীতা, আপনাকে আমরা প্রণাম করি!

শিক্ষা ও নারী

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াঽতিযত্নতঃ ।'

কন্যাকে সযত্নে পালন ও সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্ত্তব্য ।

শিক্ষা ও নারী

কি কুমারী, কি প্রবীণা সকল নারীকেই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই সর্বশক্তিস্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিত্রী জগন্মাতার প্রকাশ বিরাজিত ছিল। বলিতে গেলে তিনিই জগতের সমক্ষে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, পার্থিব শরীরী হইলেও প্রত্যেক নারী স্বরূপতঃ জগজ্জননী—'ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য' আর সেজন্যই স্বয়ং বিষ্ণুর (ঈশ্বরের) অবতার বলিয়া ('Incarnation of Visnu') সুবিদিত থাকিলেও তিনি গুরু বলিয়া (যোগেশ্বরী নামে) একজন মহীয়সী নারীকেই আপনার অধ্যাত্ম সাধনার পথপ্রদর্শিকারূপে বরণ করিয়াছিলেন। নারীকে আচার্যপদে বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতির মহত্বকে তিনি শ্রদ্ধায় সমুন্নত করিয়াছিলেন। নারীজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই শ্রদ্ধা ও পূজার মনোভাব সত্যই তাঁহাদিগকে দেববাঞ্ছিত মহিমার স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে নারীজাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, নারীজাতির উন্নতির উপর আমাদের জাতির মহত্ত্ব নির্ভর করিতেছে। বালিকা ও নারীরা সুশিক্ষা লাভ না করিলে দেশের কল্যাণ কখনই ফিরিয়া আসিবে না। যে-সমস্ত বালিকারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে ভবিষ্যতে ইহারাই একদিন আমাদের দেশের সন্তানদিগের জননী হইবে। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হিন্দুসমাজ ও জাতির প্রাণ ও গৌরবস্থল। বালিকারা যাহাতে যথার্থভাবে সুশিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের জীবনের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

সমগ্র জাতির অর্ধেক অংশ হইলেন নারী। কিন্তু এখনই তাঁহারা যথার্থ শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিতা হইয়া রহিয়াছেন। ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, এই সকল বিষয়ের যথাযথ অনুশীলনই হইল প্রকৃত শিক্ষা, আর এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা প্রকৃত জ্ঞান ও গৌরবের অধিকারী হইতে পারিব।

নারীরাই দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জননীস্বরূপা, পুরুষদের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে তাঁহাদেরই সেজন্য সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা উচিত। ভবিষ্যৎ জননীরূপা এই বালিকাদের সর্বতোভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা দেশবাসী আমাদের সকলেরই কর্তব্য; তাহা না করিলে দেশের শিশু-সন্তানগণ শক্তিমান ও মানুষ হইবার মত শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না।

দেশের বালক-বালিকাদের শক্তিমান ও প্রতিভাশালীরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথম মাতৃ-জাতিকেই সুশিক্ষিতা করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই কর্তব্যতা-বোধ বহন করিতে এখনও আমরা পরাঙ্মুখ ও নিশ্চেষ্ট। আমাদের ন্যায় জাতির পক্ষে ইহা বিশেষ কলঙ্ক বলিতে হইবে।

এই নিশ্চেষ্টতার ভাব আবার বিশেষ করিয়া আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই রহিয়াছে এবং হিন্দুনারীদের ভিতরেও বটে। বৈদিকযুগে দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে হিন্দুরা তীব্রভাবেই অনুভব করিতেন এবং তাঁহারা জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকল নারীর মধ্যেই সুশিক্ষার বিস্তার করিয়াছিলেন। বেদে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কয়েকজন মহীয়সী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্না নারীর উদাহরণও আমরা দেখিতে পাই। বৈদিক সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর ন্যায় এরূপ বহু বিদুষী নারীর নামই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণ প্রভৃতিতেও তাঁহাদের সুগভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কথা পাওয়া যায়। এই নারীগণ ব্রহ্মবিচার-সভায় তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিদিগকেও বিচারে আহ্বান করিতেন এবং কখনও কখনও তাহাতে নেতৃত্ব করিতেন।'[৬]

কিন্তু বর্তমানে জাতির কল্যাণকর শিক্ষাবিস্তারের বিষয়ে এতই আমরা নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি যে, দেশের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাবিষয়ে কোনও একরূপ চিন্তাই করিতে

চাহি না। দেশের বালক-বালিকাগণের পিতা-মাতাদের নিকট এজন্যই আমার নিবেদন, পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহারা যেন অমনোযোগী না হন। বর্তমান বালিকা-বিদ্যালয়টির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকিয়া ইহাকে জাতীয় হিন্দুবালিকা-মহাবিদ্যালয়ে (Hindu National Girl's College) আপনারা পরিণত করুন এবং এমনিভাবে বালিকাদের সুশিক্ষিতা করিয়া তুলুন যাহাতে তাহারাই যেন ভবিষ্যতে এই মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপিকা পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনের জন্য নারীশিক্ষয়িত্রীই আমাদের অধিক প্রয়োজন। বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্যে পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করা অনুচিত। বালিকাদের অভাব-অভিযোগ ও তাহাদের উন্নতি সাধনের জন্য কি করা প্রয়োজন তাহা নারী-শিক্ষয়িত্রীরা যেরূপ উপলব্ধি করিবেন পুরুষ-শিক্ষকদের পক্ষে সেরূপ করিবার সম্ভাবনা অল্প। এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকটও এজন্য আমার অনুরোধ, মেয়েদের সুশিক্ষালাভ যাহাতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় সেই বিষয়ে তাঁহারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন। এই বিদ্যালয়ে দুইজন মহিলা অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্তা আছেন জানিয়া সত্যই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আমি চাই শুধু এই দুইজন নন, আরও অন্ততঃ চব্বিশ জন অধ্যাপিকা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকার্যে

নিযুক্তা হউন। আমাদের আশানুযায়ী এই প্রকার বিচক্ষণ কর্মী ও সহৃদয়া নারী-শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিলে তাঁহারাই আবার একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইয়া নূতন নূতন স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

একটি দুঃখের কথা আজ আপনাদের নিকট প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, শুনিলাম নাকি এই জাতীয় বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টান প্রচারিকাদের (missionary ladies) দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হিন্দুনারীদের দ্বারা এই কার্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং তাহাতে কল্যাণকর হইবে। মিশনারী শিক্ষয়িত্রীদের অপেক্ষা হিন্দুনারীদের যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা কোন অংশে হীন নয়, বরং অনেকাংশে বেশী। সত্য কথা বলিতে কি, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষাই আমি করিতেছি যেইদিন হিন্দুকন্যা-মহাবিদ্যালয়গুলির প্রধান অধ্যক্ষার পদে আমাদের ভারতীয় বিদুষী নারীরা সগৌরবে সমাসীন থাকিবেন এবং তাঁহাদের সযত্ন দৃষ্টি ও স্বাধীন কল্যাণময়ী প্রেরণায় এইগুলি পরিচালিত হইবে!

স্বাধীন আমেরিকা দেশের কার্যপ্রণালী এইদিক দিয়া সমস্তই ভিন্ন ও অভিনব। আপনারা যদি একবার আমেরিকায়

যান, দেখিবেন—নারীশিক্ষা কী আশ্চর্যভাবে সেখানে দিন দিন প্রসারতা ও উন্নতির পথে চলিতেছে। সেখানকার বালিকারা উচ্চশিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সমগ্র জাতি ও সমাজের নিকট এক্ষণে গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনপ্রণালী প্রত্যেক দিক দিয়া সত্যই সুন্দর! অল্পবয়সে বিবাহ করিবার প্রথা (child marriage) সেখানে নাই, '' নারীরা সমস্ত যৌবনই সেখানে শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জনে কাটাইতে পারেন। একজন নারীকে আমি আমেরিকায় দেখিয়াছিলাম, বয়স তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র, অপূর্ব তাঁহার চরিত্র। সেই বিদুষী সুচরিত্রা নারী তাঁহার জীবনের সমগ্র শক্তি শিক্ষানুশীলনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন!

আমেরিকার অধিকাংশ মেয়েরা আবার বিবাহ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, বিবাহকে তাঁহারা জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনার পথে বন্ধন বলিয়া মনে করেন। স্বাধীনতা ও জ্ঞানার্জন তাঁহাদের জীবনের ব্রত। আপনারা সেই দেশে গেলে দেখিবেন, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ সমস্তগুলিতেই কেরাণী, শিক্ষয়িত্রী ও অধ্যাপিকার কার্য সব মেয়েরাই করিয়া থাকেন। সংখ্যার অনুপাতে ও যোগ্যতায় নারীরাই সেখানে পুরুষদের অনেকস্থলে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীমূলক (Kindergarten System),

প্রাথমিক, উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে সমস্তই শিক্ষাদান-কার্যে নারী-শিক্ষয়িত্রীরা নিযুক্তা আছেন। ভারতবাসী আমাদেরও কর্তব্য নয় কি, দেশের মেয়েদের আমরাও সেইরূপভাবে সুশিক্ষিতা ও উপযুক্ত করিয়া তুলি ?

মিশনারীদের বিদ্যালয়ে এজন্য আমি মেয়েদের পাঠাইবার পক্ষপাতী নই, সেখানে জাতীয় শিক্ষা ও আদর্শ তাহারা কিছুই লাভ করিতে পারে না। মিশনারীদের বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার সমস্তই আমাদের জাতীয়তার বিরোধী, তাহা হইতে গঠনমূলক কোন কিছুই শিক্ষা করিবার থাকে না। মিশনারীদের শিক্ষাদানপ্রণালী অবশ্য তাঁহাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু-সমাজের তাহাতে কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং বিরোধী হইবে। এদিক দিয়াও আমাদের সকলের দৃষ্টি জাগ্রত রাখা উচিত।

ভারতবাসী আপনাদের সকলের উৎসাহ, চেষ্টা ও কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সর্বপ্রকার কুপ্রথার স্রোতকে প্রতিরোধ করা উচিত। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও গৌরব পিতামাতাদের দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বালক-বালিকাদের পিতা-মাতারা যদি ঐ সমস্ত জাতীয়তার বিরোধী ভাবকে প্রশ্রয় দান করেন তবে বুঝিতে হইবে নিজেদের ধ্বংসের পথ তাঁহারা নিজেরাই পরিষ্কার

করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ভবিষ্য বংশধরগণের গৌরব বর্তমান পিতামাতাগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, দেশের ও জাতির কল্যাণকর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহারা যেন সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সহায়তা দান করেন। আমিও আশা করি, তাঁহাদের সে মহতী প্রচেষ্টা অবশ্যই কৃতকার্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

সঞ্চয়ন

'মেয়েদের উন্নত করতে হবে। তবেই আবার সেই সীতা, সাবিত্রী, মৈত্রী, গার্গী ও অপালা প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী নারী জন্মাবে, তারাই এই জাতিকে উদ্ধার করবে। মেয়েদিগকে আদর্শ মা হতে হবে! আদর্শ মা না হলে আদর্শবান্ পুত্রও জন্মাবে না। মেয়েদিগকে ত্যাগ, সংযম, কঠোরতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ইত্যাদি শিক্ষা করে চরিত্রবতী হতে হবে—তবেই দেশের কল্যাণ হবে, তবেই এই জাতির পুনরুত্থান সম্ভব হবে।'

স্বামী অভেদানন্দ

সঞ্চয়ন

ভারতে ও আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে নারীজাতির শিক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন সেগুলিও এখানে একত্রে চয়ন করিয়া দেওয়া হইল :

১। বাঙ্গালোর ছাত্রসম্মিলনীর উদ্দেশ্যে (*Address to the Students of Bangalore, Madras*) :

নৈতিকভাবে জীবনযাপন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। নারীজাতি আমাদের সমগ্র হিন্দুসমাজের জননীস্বরূপা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'নারীজাতি জগজ্জননী আদ্যাশক্তির প্রতিনিধি বা প্রতিচ্ছবি।' বৈদিক আদর্শে আমাদের জীবন ও মনকে গঠন করিতে হইবে। জ্ঞান ও শিক্ষা সর্ববিষয়েই নারীজাতিকে অধিকার দান করা আমাদের কর্তব্য।

নারীদের শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া কোন জাতি জগতে বড় হইতে পারে না। শিক্ষা এবং অন্য কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের সুযোগ অবশ্যই দিতে হইবে। নারীজাতির প্রতি কল্যাণেচ্ছা আবার আমাদের ফিরিয়া আসিতে পারে। বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী এবং গার্গীর মত মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ও বিদুষী নারীগণের আবির্ভাবে সত্যই ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল! বর্তমানেও আমরা আবার সেইরূপ নারীগণের অভ্যুদয় আশা করিতে পারি।[৭৮]

২। মহীশূর ছাত্রসম্মিলনীর অভিভাষণে (*Address to the Students of Mysore*):

নারীজাতিকে আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের প্রত্যেকেরই অনুসরণ করা উচিত।

শুধু ছেলেরাই যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিবে তাহা নহে, মেয়েদেরও সেভাবে শিক্ষিতা করিতে হইবে। বালিকাগণকে ব্রহ্মচারিণীরূপে শিক্ষিতা করিয়া আদর্শ নারীজাতি গঠন করিতে হইবে। প্রত্যেক পুরুষ যদি শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে জীবন গঠন করেন এবং নারীজাতি যদি সীতার আদর্শ অনুসরণ করেন তবে পার্থিব জীবনও মধুময় হইয়া উঠিবে। আত্মার পবিত্র স্বভাবই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আত্মা শুদ্ধ, স্বাধীন ও মৃত্যুঞ্জয়, তিনি পুরুষও নন এবং নারীও নন। এই ভাবসম্পন্ন ব্রহ্মচর্যময় জীবনই আমাদের পালনীয়। সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, নারীজাতি জগন্মাতার পার্থিব প্রতিমূর্তি।[৭৯]

৩। কলিকাতার ছাত্রসংসদে (*Advice to the Young Men of Calcutta*):

বালিকাদের শিক্ষাদান করা অবশ্য কর্তব্য। শরীর গঠন করিবার জন্যও তাহাদের শিক্ষিতা করিতে হইবে, ইহাও আমাদের একটি প্রধান কর্তব্য। আমেরিকার বিদ্যালয়ে কি বালক, কি বালিকা উভয়কেই নিত্য নিয়মিমভাবে স্বাস্থ্য গঠন করিতে শিক্ষা

দেওয়া হয়। সেখানে (আমেরিকায়) বালিকারা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। শরীরের মাংসপেশী তাহাদের সবল, বুদ্ধিতে তাহারা প্রখরা এবং নৈতিক জীবনেও উন্নত। মানুষের সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারে। শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিছু কিছু প্রাণায়ামও অভ্যাস করে, স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতিও সেজন্য তাহাদের যথেষ্ঠ।[৭৯]

নারীজাতিকে সর্ববিষয়ে সুযোগ-সুবিধা দিলে তাঁহাদের মধ্যে আশ্চর্যরূপে শক্তির বিকাশ হইতে পারে। বহুকাল ধরিয়া এই সুযোগলাভ হইতে তাঁহাদিগকে সত্যই বঞ্চিতা রাখা হইয়াছে, এজন্যই মনে হয়, সমাজের সকল কার্যে তাঁহারা একটু পশ্চাতেই পড়িয়া রহিয়াছেন।[৮০] সুযোগ পাইলে তাঁহারা আবার পুরুষের ন্যায় বহু বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারেন। কর্মী হিসাবেও তাঁহারা জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পরিগণিতা।

একথা ভুলিলে আমাদের চলিবে না যে, এই দেশেই শ্রেষ্ঠ নারী-যোদ্ধারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত নারী চাঁদবিবি তাঁহাদিগের অন্যতমা। ঝাঁন্সীর রাণীর অপরিসীম বীরত্বের কথা আমরা এখনও ভুলি নাই; মিউটিনীর সময় তিনি ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সহিত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে, শত্রুপক্ষের অধিনায়িকারূপে সত্যই তিনি মহিয়সী ছিলেন। পুরুষের ন্যায় সেনানায়কের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নারী সত্যই আমাদের ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানেও নারীদের সর্বপ্রকার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, তবেই তাঁহারা আপনাদের শক্তির যথার্থ বিকাশ সাধন করিতে পারিবেন। প্রত্যেক নারীকেই জগজ্জননী মহামায়ার প্রতিনিধি বলিয়া আমাদের মনে করা উচিত।

আমেরিকাবাসীরা আজ জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত, কারণ তাঁহারা মহাশক্তির উপাসক। আমাদের দেশেও বীর মহারাষ্ট্রনেতা শিবাজী শক্তিসাধনা করিয়াই ভারতের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিরূপিণী নারীর কখনও অমর্যাদা করিতে নাই। নারী ভোগ্যা নন, চিরপূজ্যা। নারীর প্রতি ভোগলোলুপা দৃষ্টি পাপকার্য বলিয়াই পরিগণিত। দৃষ্টিভেদেই পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রের উপদেশও তাহাই।

একমাত্র নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য সমস্ত নারীর প্রতি প্রত্যেক পুরুষের মাতৃজ্ঞান করা কর্তব্য। সত্যই যদি এই নীতি ও শাস্ত্রবাক্য আজ আমরা প্রতিপালন করি, তাহা হইলে সর্ববিষয়ে উন্নত আমেরিকাবাসীদের ন্যায় আমরাও জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইব। নারীগণকে জগজ্জননীর প্রতিনিধি বা মহাশক্তির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে জ্ঞান করিতে শিক্ষা করা উচিত। তাঁহারা মাতৃজাতি, আমরা তাঁহাদের সন্তান—এই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মধ্যে আসিলে তবেই আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁহাদের আশীর্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইব।[৮১]

৪। এলাহাবাদ অভিভাষণে (*Address at Allahabad*):

সমাজে নারীজাতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্বপ্রথম করিতে হইবে।

নিজ নিজ গৃহই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। নারীকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান না করিলে সংসারে কখনও উচ্চাদর্শের অনুপ্রেরণা আসিতে পারে না। জননীরা শিক্ষিতা না হইলে উপযুক্ত পুত্র-কন্যাগণের আশাই বা আমরা কিরূপে করিতে পারি? দেশের পুত্র-কন্যাগণ শিক্ষিত এবং সত্যকার মানুষ না হইলে পবিত্র জন্মভূমি ভারতের চিরাচরিত গৌরব রক্ষিত হইতে পারে না। কোন জাতির উন্নতি তাঁহাদের দেশের নারীজাতির শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।[৮২]

৫। আমেদাবাদে বক্তৃতায় (*Address at Amedabad*):

এই ভারতে এমনই এক সময় ছিল যখন পুরুষদের ন্যায় নারীরাও উপযুক্তরূপে শিক্ষালাভ করিতেন। কাত্যায়নী, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী নারীগণ তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহারা যে ভারতের এরূপ মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহার কারণ তখনকার বৈদিক সমাজ স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। বর্তমান ভারত যতদিন না স্ত্রীশিক্ষার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে ততদিন সেও যথার্থ জাতিরূপে বিশ্বের সম্মুখে নিজের সগৌরব পরিচয় দান করিতে পারিবে না।[৮৩]

৬। বোম্বাই অভিভাষণে (*Address at Bombay*):

বৈদিক ঋষিরা সর্বদাই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য সেই যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী প্রভৃতি বিদুষী নারীগণের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। বেদ ও উপনিষদ পাঠ করিলে দেখা যায়, তদানীন্তন যুগে হিন্দুনারীরা কত গভীর জ্ঞান ও বিদ্যার অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অবমাননায় সেরূপ নারী আর আমাদের দেশে

বর্তমানে জন্মগ্রহণ করিতেছেন না।[৮৪] শাস্ত্রকারগণও নির্দেশ দিয়াছেন, পতিরা তাঁহাদের পত্নীগণকে সুশিক্ষা দান করিবেন এবং পিতা-মাতা তাঁহাদের কন্যাগণকে সর্ববিষয়ে শিক্ষিতা করিবেন, কিন্তু বর্তমানে পিতা-মাতাগণ যে যাঁহার জীবিকা উপার্জনেই সময়াতিপাত করিতেছেন, পুত্র-কন্যাদের যথার্থভাবে শিক্ষাদান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই।

সমাজে মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করা উচিত। আমেরিকায় আমি দেখিয়াছি, মেয়েরা কত শিক্ষিতা। সেখানে অবিবাহিতা ও শিক্ষিতা নারীরা অনেকেই কত পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। বিবাহের পূর্ব-পর্যন্ত অন্ততঃ বালিকাদিগকে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা কর্তব্য।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অনেকাংশে স্ত্রীলোকেরাই বরং সেখানে পুরুষদের অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমতী। সকল রকমের কাজই তাঁহারা সেখানে পুরুষদের ন্যায় করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমতী মোটেই নন, কেবল যথোপযুক্ত সুযোগের অভাবেই সমাজে তাঁহাদের দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। সর্ববিষয়েই মেয়েদের সেজন্য সুযোগ দান করা কর্তব্য এবং তাহা হইলেই তাঁহারা দেশের গৌরব আবার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।[৮৫]

৭। বহরমপুর অভিভাষণে (*Lecture at Berhampur*):

আমেরিকাবাসীর একটী অসামান্য গুণ এই যে, নারীর যথার্থ মর্যাদা তাঁহারা দান করেন। হিন্দুরাও শক্তির উপাসক। কিন্তু ইহা সত্য

যে, যতদিন না তাঁহারা নারীজাতিকে জগজ্জননীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে শিখিতেছেন ততদিন তাঁহাদের সত্যকার শক্তিউপাসক বলা যাইতে পারে না। এই সব দিক দিয়া আমেরিকাবাসীরাই বরং সত্যকার শক্তিসাধক, আর সেজন্য তাঁহারা জাতীয় গৌরবলাভ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন।

আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ করিতে চান না। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার একেবারে বিবাহই করিতে ইচ্ছুক নন। পুরুষেরাও সেখানে ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে নিজেদের বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন না, অথচ তাহাদের স্বভাব ও চরিত্র নির্মল ও পবিত্র।

বিবাহই জীবনের চরম আদর্শ নয়। পবিত্রতা, সুচরিত্র এবং ত্যাগই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। হিন্দুরা কিন্তু বিবাহকে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র আদর্শ বলিয়া মনে করেন। হিন্দুর চক্ষে পত্নী পতির সহধর্মিণী—সংসার ও ধর্মজগতের সহচারিণী। পার্থিব স্থুল শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই পতি-পত্নীর পবিত্র বন্ধন হিন্দুর নিকটে কখনও ছিন্ন হয় না, মৃত্যুর পরেও তাহা অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান থাকে।[৮৬]

৮। জামসেদপুর বক্তৃতায় (*Lectures at Jamshed-pure*):

আমেরিকায় যখন আমি একদিন 'হিন্দুধর্মে নারী' (*Woman's Place in Hindu Religion*) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়া বৈদিক ধর্মানুযায়ী ভারতীয় নারীদের আদর্শ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছিলাম তখন

সেখানকার খৃষ্টান মিশনারীরা আমার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে একরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আমেরিকায় নিউইয়র্ক সহরে (New York) বিশপ পটার নামে একজন সর্বজনপরিচিত ধর্মশিক্ষক ছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ ও নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত ছিলেন। তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া তখনই বলিয়াছিলেন: 'স্বামী অভেদানন্দ প্রকৃতপক্ষে একজন পণ্ডিত এবং ভদ্রলোক। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা অতীব সত্য, এবং আমি তাহা জানি, কাজেই খৃষ্টান প্রচারকদের কোন কথাই আমি শুনিতে চাহি না।'

আপনারা জানেন যে, বেদে বহু অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্না নারীর নাম পাওয়া যায়; যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং বিশ্ববারা প্রভৃতি। তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ও ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িত্রী ছিলেন। বৈদিক যুগে যথার্থ ই তাঁহারা জ্ঞানমহিয়সী নারী ছিলেন।[৮৭]

যখন আমরা মানবজাতির কথা বলি, তখন মাতৃজাতির কথা একরূপ ভুলিয়াই যাই। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নারীও পুরুষের ন্যায় অর্ধেক অংশ। নারীজাতির প্রকৃত মহিমা আপনারা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আর সেজন্যই মনে হয় আমাদের সমাজ আজ এত অবনত।

মনে রাখিতে হইবে, পত্নী, ভগিনী, দুহিতা ও মাতা সকলে সেই একই মাতৃজাতির অন্তর্গত। ভবিষ্যতে যাঁহারা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হইয়া আপনাদের স্থলে দাঁড়াইবেন এই বালিকারা তাঁহাদেরই জননী। নারীগণ যথার্থ শিক্ষালাভ না করিলে সন্তানরাও তাঁহাদের শিক্ষিত হইতে পারিবে না।

নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আপনারা সর্বপ্রথমে করুন। এমন-ভাবে তাঁহাদের সুশিক্ষিতা করিয়া তুলুন ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা মহিয়সী ও যশস্বিনী হইতে পারেন। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ও নানারূপ শিক্ষার প্রবর্তন করা উচিত। তাঁহাদের শিক্ষকও হইবেন নারী।

আমেরিকায় আমি দেখিয়াছি, পুরুষদিগের অপেক্ষা নারীরাই শিক্ষিতা অধিক। সেখানে তাঁহাদের সুযোগ-সুবিধা সকল রকমই দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারাই সেখানে সমাজের অধিনেত্রী। গত মহাসমরের সময়ে মিত্রশক্তির মধ্যে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহারও কারণ একমাত্র নারী, পুরুষ নহে। পুরুষেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন তখন নারীরাই গৃহকর্মের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহারা সর্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুতরাং নারীদের কথা ভুলিলে চলিবে না। ভারতীয় নারীদের গত বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ভারতবর্ষই চাঁদবিবি ও ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতির ন্যায় মহীয়সী নারীদের বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। গত মিউটিনীর সময় ঝাঁন্সীর রাণী সেনাপতির ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজদের বিপক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। বৃটিশ সেনাপতি বুঝিতেই পারেন নাই যে, তাহাদের শত্রু-সেনাপতি একজন নারী ও তিনি স্বয়ং ঝাঁন্সীর রাণী। এইরূপ মহিয়সী নারীগণই আমাদের দেশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন!

সমগ্র হিন্দুধর্মের আদর্শ হইল নারীজাতিকে সুশিক্ষিতা করা। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে—কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক ও ধর্মের দিক দিয়া সর্বপ্রকারেই তাঁহাদের সুশিক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শুধু হিন্দুনারীদের জন্য নহে, অখণ্ড নারীজাতির

জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। শিক্ষার সার্বভৌমিক সাম্রাজ্যে কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর স্থান থাকা উচিত নয়। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়া সর্বজাতির নারীদের জন্যই উদারভাবে শিক্ষার আদর্শ বিতরণ করিতে হইবে। মুসলমান বালিকাদের জন্যও এই সার্বজাতিক শিক্ষামন্দিরের দ্বার চির-উন্মুক্ত থাকিবে। খৃষ্টান, পারসিক ও হিন্দু সকলেই শিক্ষার অখণ্ড দৃষ্টিতে এক ও অভেদ,—ধর্ম, উপাসনা ও সমাজের ব্যাপারেই কেবল বৈচিত্র্য।[৮৮]

* * * *

সন্তান-সন্ততির জন্য যখনই আপনারা কিছু করিবেন, সে সময়ে ইহাই চিন্তা করিবেন, পুত্র-কন্যারূপী শ্রীভগবানের অর্চনাই আপনারা করিতেছেন। পত্নী, ভগিনী বা মাতার সহিত যখনই আপনারা ব্যবহার করিবেন তখনই ভাবিবেন তাঁহারা মূর্তিমতী ঈশ্বরী, জগজ্জননীর অপার্থিব রূপ তাঁহাদের মধ্যে সর্বদা বিরাজিতা। অথবা আপনার কন্যা বা মাতার জন্য যখনই কিছু করিবেন, সে সময়ে চিন্তা করিবেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বরীকেই আপনারা অর্চনা করিতেছেন।

আপনারা হয়তো মনে করিবেন, এ-কথা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত; কিন্তু ইহা সত্য যে, নারীগণের প্রতি পবিত্র আচরণ ও আদর্শ পোষণ করাই আমাদের ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। বেদান্তের শিক্ষাও তাই। ইহা কর্মযোগেরও নামান্তর।

স্মরণ রাখিবেন, নারীগণ আজ এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, কি উচ্চ, কি নীচ, সকলেই সেই আদ্যাশক্তিরই প্রতিনিধি। আর এই দিব্য ধারণাই নারীজাতিকে বিশ্বমাতৃত্বের স্বর্ণসিংহাসনে চির-সমাসীন রাখিবে। হিন্দুধর্মের এই মহান্ আদর্শ আর কোন জাতির মধ্যেই

যথার্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানে সেই আদর্শের অবনতির জন্য দায়ী কাহারা?—আপনারাই। আপনারাই এই সুমহান্ আদর্শকে অবহেলা করিয়া নারীজাতির ভাগ্য-গগনকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন! আপনারাই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী! আপনারাই তাঁহাদের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিয়া অজ্ঞানতার আবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধীনা ও শৃঙ্খলিতা করিয়াছেন: আর এজন্যই বোধ হয় ভারতের শুচিশুভ্র আকাশ আজিও ধূলি-কালিমায় সমাচ্ছন্ন ও অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে! নারীজাতিকে আপনারা উন্নত করুন, শিক্ষার আলোকে তাঁহাদের আলোকিত করুন। প্রতিদিন তাঁহাদের শিক্ষা দিন—আপনারা মানবী নন, দেবী,—জগতের ঈশ্বরী আপনারা। যাহা কিছু স্বার্থপরতার বন্ধন, সমস্তই ভ্রম; সমস্তই ভুলিয়া সকল কার্য আপনাদের ঈশ্বরের জন্য—শ্রীভগবানের পূজাস্বরূপে করিতে হইবে, তবেই আবার জীবন আপনাদের পবিত্র ও সুমহান্ হইবে![৮৯]

৮। ভারতীয় সংস্কৃতি (*India and Her People*):

ভারতে শৈব ও বৈষ্ণবগণ যেমন ঈশ্বরকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আদর্শ পুরুষোচিত সর্বপ্রকার গুণে বিভূষিত করেন, বহু হিন্দুও সেরূপ আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে জগতের প্রসবিত্রীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আদ্যাশক্তি জননী বলিয়া অর্চনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষই বলিতে গেলে একমাত্র দেশ যেখানে ঈশ্বর মাতৃরূপে কল্পিত এবং সমস্ত নারীজাতিই জগজ্জননীর প্রতিনিধিরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের ঈশ্বরানুভূতি লাভ বা মুক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু এরূপ নির্দয় ও অসম্ভব কল্পনা হিন্দুরা

কখনই করিতে পারেন না; নারীকে তাঁহারা জগতের ঈশ্বরী বলিয়াই শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুরা জানেন, আত্মা পুরুষও নন, স্ত্রীলোকও নন; জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই ঈশ্বরকে তাঁহারা পুরুষ বা স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন মাত্র।[২০]

৯। **শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী** (*Memoirs of Ramakrishna*):

(ক) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন—কি কুমারী, কি যুবতী বা বৃদ্ধা সকল নারীই আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতিনিধি। তিনি বলিতেন, মহামায়া তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, নারীমাত্রেই সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি। বিশ্বের ধর্মেতিহাসে এরূপ নিদর্শন বাস্তবিকই এই প্রথম; কোন অবতারই ঠিক এইরূপভাবে নারীজাতিকে মহিমময় দেবীত্বের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এই পবিত্র ও আদর্শকে অনুসরণ করিলে সকল মানবই, বিশেষতঃ নারীজাতি তথাকথিত এই সভ্য সমাজের সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবেন।[২১]

পরিশিষ্ট

—ফুটনোট—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পরিশিষ্ট

১। Louis Jacolliot : *The Bible in India*, p. 201.

২। Louis Jacolliot : *The Bible in India*, p. 205.

৩। Roman Emperor, *Justinian* I. (483-565 A. D.)

৪। মনু, ১ম অ° ৩২

৫। বেদেও ঠিক এই কথার বীজ নিহিত আছে। ঋগ্বেদের বিরাট্—পুরুষ, নারী নন। নারী বিরাট্ পুরুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইলেন। বেদের অঙ্কুরই পরে পুরাণ প্রভৃতিতে ফল-ফুলশোভিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা প্রথমে প্রকাশ করেন—'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ' (১.৪.১৭)। তিনি আপনারই অর্ধেক অংশ হইতে জায়া অর্থাৎ পত্নীকে সৃষ্টি করিলেন। তিনি আর একক হইয়া থাকিতে পারিলেন না—'স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ই মমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্' (১.৪.৩)। অবশ্য মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি এবং টীকাকার কুল্লূকভট্টও এই শ্লোকে এই সব কথারই অবতারণা করিয়াছেন।

বাস্তবিক দেখা যায়, সৃষ্টি এই জগতে নিম্নস্তরের bioplasm হইতে আরম্ভ করিয়া bisexual পর্যন্ত একাধারে সেই অর্ধনারীশ্বর-মিথুনের পূর্ণরূপ প্রদান করিয়াছে। তিনি দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন—'স

দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।' এই দ্বিতীয়ই তাঁহার (বিরাট্ পুরুষের) সহচারিণী। তখন হইতে তিনি অর্ধনারীশ্বর-রূপে পরিচিত হইলেন এবং ইনিই তন্ত্রের 'অহং ও ইদং'-এর (প্রকাশ ও বিমর্শশক্তির) চণকাকারে একরূপ। মেধাতিথি এজন্য এখানে বলিয়াছেন: 'অর্ধেন নারীগৌরীশ্বরভঙ্গ্যাঽথবা পৃথগেব তাং নির্মিতবান্। * * ইদমপি জায়াপত্যোঃ শরীরমাত্রভেদাৎ সর্বত্র কার্যেষ্ববিভাগাৎ তদালম্বনং দ্বৈধংকার বচনম্।'—

৬। ঋগ্বেদ, ৫ম° ৬১ সূ° ৮ শ্লো°

৭। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার সুবিখ্যাত *Why a Hindu accepts Christ and rejects Churchianity* পুস্তিকায় (পৃ° ১০-১১) এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন: 'খৃষ্টানদের চার্চীয় ধর্ম আদমের (Adam) প্রলোভন ও স্বর্গ হইতে পতনের ঘটনাটি বেশ নাটকীয়ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন এবং সেই পতনকে তাঁহারা জগতের যত কিছু অনর্থ ও দু:খের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। হিন্দুরা কিন্তু এই কথা আদৌ বিশ্বাস করেন না, ইহাকে বরং তাঁহারা আদিম কালের উপকথা এবং অনুর্বর ও অপরিণত মনের সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। * * তাঁহারা বলেন, পাপ আকাশ হইতে পড়ে নাই, ইহা মানুষেরই স্বার্থপরতা। মানুষ যে তাহার ঈশ্বরীয় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এই না-পারা রূপ অজ্ঞানের নামই পাপ।'

৮। যদিও একথা সত্য যে, সেণ্ট পল্ (St. Paul) প্রকৃতপক্ষে 'higher authority of Christ,' এবং 'Paul was the first to understand the history of religion as a divine education of the human race,' তথাপি নিউ টেষ্টামেণ্টে

(New Testament) নারীদের প্রতি তিনি উদারতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং কলঙ্কের ভাগী করিয়াই পুরুষের দুষ্কৃতির জন্য দায়ী করিয়াছেন নারীকে এবং ধর্মশিক্ষা হইতেও তাঁহাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। ডাঃ হফ্‌ডিঙ Dr. H. Hoffding এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার *Philosophy of Religion (1932)* বইয়ের ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন : 'The Apostle Paul had indeed forbidden women to speak in the churches, and had bidden them consult the men in religious matters. And since they were lacking in the scholastic education of the men mystics, they must have been keenly alive to the insecurity of their position.'

সেইজন্য ডাঃ হফ্‌ডিঙ্‌ এ' সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া : 'Hence convinced though they were that their highest experiences were of divine origin, yet they submitted themselves entirely to the authority of the church.'

সেণ্ট পলের ইঙ্গিতে নারীজাতির ভাগ্য-গগন যে ধর্মজগতে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং সেই দুরদৃষ্টের রোষানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন যে শুধু সামান্যা নারীগণ নন, অসামান্যা বিদুষী এন্‌জেলা দে ফোলিয়োঁ (Angela de Foligno) ও সেণ্ট থেরেসা (St. Theresa) প্রভৃতি মরমীয়া (mystic) ধর্মসাধিকাগণও তাঁহাদের জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন এবং সে-বিষয়ে ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। ডাঃ অটো ফ্লাইডারার (Dr. Otto Pfleiderer) তাঁহার *Philosophy of Religion*

(Vol III, p. 218) পুস্তকে খৃষ্টধর্মে চেতনার বিকাশসম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন : 'How much, in particular, the worship of Mary and of other holy women did to raise the estimation of women both in their own eyes and in those of the other sex, and so to purify and ennoble social and individual life, it is quite impossible to say.' অর্থাৎ ধর্মচেতনার বিকাশের সাথে সাথে কোন্ সময়ে যীশুমাতা মেরী ও অন্যান্য পবিত্রচেতা নারীদের অর্চনার প্রচলন করিয়া খৃষ্টানেরা সমগ্র নারীজাতির সঙ্গে তাঁহাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নীত করিয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে খৃষ্টান-ধর্মেতিহাস অবশ্য ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছে। এ' সম্বন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত "তীর্থরেণু"-র দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও তাঁহার *Why a Hindu accepts Christ and rejects churchianity* পুস্তিকায় (পৃ° ৩) সামান্যভাবে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'খৃষ্টান চার্চের ইতিহাস (Ecclesiastical History) যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, নিসিয়ার (Nicea) মহাধিবেশনের আলোচনায় একবার কুমারীরা লাঞ্ছিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, পবিত্র গির্জা কলঙ্কিত হইয়াছিল, * * খৃষ্টান সন্ন্যাসীগণ পদদলিত হইয়াছিলেন।' কাজেই খৃষ্টানদের ধর্মে ও মন্দিরে যে নারীজাতির অবমাননা প্রভৃতি হয় নাই তাহা কে অস্বীকার করিবে? এ' সম্বন্ধে ডাঃ এ. এস. আল্‌টেকর প্রণীত *The Position on Women in Hindu Civiliation (1938)*, পৃ° ৩৯৮-৪০১ দ্রষ্টব্য।

৯। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে এই ১২৬-তম সূক্তে প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত সাতটি শ্লোক আছে। যথা, "অমন্দান্ স্তোমান্ প্রভরে মণীষা * * * সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা ১-৭॥ ভাষ্যকার সায়ণ উল্লেখ করিয়াছেন: * * "সপ্তম্যা রোমশানামব্রহ্মবাদিনী আদিতঃ পঞ্চানাং ভাবয়বস্য স্তুতিরূপত্বাৎ স এব দেবতা।' * * রোমশানাম বৃহস্পতেঃ পুত্রী ব্রহ্মবাদিনী * *"। ৭

১০। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে এই ১৭৯-তম সূক্তে প্রথমা হইতে ষষ্ঠী পর্যন্ত ছয়টি শ্লোক আছে। যথা, "পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবস্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ। * * সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগাম। ১-৬॥ ভাষ্যকার সায়ণও বলিয়াছেন: * * অত্র ত্রয়াণাংদ্দৃচানাং লোপমুদ্রাগস্ত্য তচ্ছিষ্যৈর্দৃষ্টত্বাত্তত্রবর্ষয়ঃ। * * লোপমুদ্রাঃ আহ হে অগস্ত্য! * * * অগস্তস্তামাহ ভোঃ পত্নি!" * *। লোপমুদ্রা ঋষি অগস্তের পত্নী।

১১। ব্রহ্মবাদিনী বাক্‌ও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ১২৫ তম সূক্তের রচয়িতা। যথা—'অহংরুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।' হইতে 'পরোদিবাপরত্রনাপৃথিব্যৈতাবতী মহিনাসংবভূব। ১-৮॥ ইহাতে প্রথমা হইতে অষ্টমী এই আটটি শ্লোক আছে। ভাষ্যকার সায়ণ 'অংভৃণস্য মহর্ষে দুর্হিতা বাগ্নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী' বলিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী বাক্ এই সূক্তের দ্রষ্ট্রী—'অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রীবাক্'। তিনি 'সর্বানি ভুবনানি * * অহমেব পরেণানধিষ্ঠিতা স্বয়মেব * * সর্বজাদাত্মনা অহং সংভৃতাস্মি';—অর্থাৎ পরমব্রহ্মের চরম রহস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১২। ইহা ছাড়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের সম্রাট বীর

কম্পরায়ের পত্নী নারীকবি গঙ্গাদেবী, তাঞ্জোরের রঘুনাথ ভূপের বিশিষ্ট সভাকবি জ্ঞানমহীয়সী নারী মধুরবাণী, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলারাজ পদ্মসিংহের মহিষী নারীস্মার্ত বিশ্বাস দেবী, ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই এবং রাণাকুম্ভের বিদুষী পত্নী মীরাবাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও ইঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না কেহ ছিলেন কিনা জানি না, তথাপি সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বের উজ্জ্বল আদর্শের ছিলেন ইঁহারা জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ।

১৩। "অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে বভূবতুঃ, মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব" * * (বৃহ° উ° ৪.৫.১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধুকাণ্ড ৪.৫.১ হইতে ৪.৫.১৫ পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ এবং ৩.৬.১ হইতে ৩.৮.১২ পর্যন্ত গার্গী- যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ আলোচিত হইয়াছে।

দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন: "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎস্থানাদস্মি" (বৃহ উ° ৪.৫.২)। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি'— দ্বৈতই ভেদবুদ্ধির কারণ বলিয়া পরিশেষে 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা * * অসঙ্গো * * বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ,' বলিয়া সেই সর্ববস্তুর জ্ঞাতা, অবভাসক বা সাক্ষীস্বরূপ অসঙ্গ ব্রহ্মকে নেতিমুখে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিদুষী গার্গী সম্বন্ধে দেখা যায়, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যাজ্ঞবল্ক্য তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন: 'অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী প্রপচ্ছ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, যদিদং সর্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ, কস্মিন্নু খল্বাপ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি * (বৃহ° উ° ৩.৬.১)। * * কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। স হোবাচ, এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণু * * * এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ," * * * (বৃহ° উ° ৩.৮.৭-৯)।

গার্গী বাচক্নুর কন্যা। এখানেও যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সকল প্রকার উপাধিবিহীন, অপরিচ্ছিন্ন সকলের প্রকাশক ও অব্যাকৃত হইতে আকাশ পর্যন্ত সকল প্রপঞ্চের ধারয়িতা সর্ববিজ্ঞাতা নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ছাড়া আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এই গার্গী বাচক্নবী, সুলভা মৈত্রেয়ী এবং বাড়বা প্রাতিথেয়ীর প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাভারতেও আছে, রাজা জনকের সভায় মৈত্রেয়ী ব্রহ্মতত্ত্ব-আলোচনায় নিযুক্তা। এতদ্ব্যতীত দেখা যায়, সাধ্বী ও বিদুষী দ্রৌপদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত বহুবার ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছিলেন। পালি বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, কোশলরাজ্যে শ্রাবস্তীর অধিবাসিনী এবং অগাধ ঐশ্বর্যশালিনী মহিলা বিশাখা তদানীন্তনকালে সমস্ত নাগরিকগণের পূজ্যা এবং মাননীয়া ছিলেন।

১৪। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'ইণ্ডিয়া এণ্ড হার্ পিপল্' (*India and Her People*) পুস্তকেও (পৃ° ৬৯-৭০) উল্লেখ করিয়াছেন: 'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রাচীনকাল হইতে কেবলমাত্র ভারতে ঈশ্বর মাতৃভাবে পূজিতা হন। এই ভারতেই সমগ্র নারী-জাতিকে জগজ্জননীর অর্থাৎ স্বর্গীয় মাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহরূপে মনে করা হয়। অনেকের ধারণা যে, হিন্দুদের মতে নারীজাতির মোক্ষ লাভ হয়

না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা এরূপ অজ্ঞতা কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা এই নিখিল বিশ্বের ঈশ্বরকেও মাতৃভাবে কল্পনা করিয়াছেন—জগৎ প্রসবিত্রী বলিয়াছেন।

পুনরায় তাঁহার 'মাদারহুড্ অফ্ গড্' (*Motherhood of God*) পুস্তকেও (পৃ° ৯-১০) এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে কেবল ভারতবর্ষেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জগজ্জননীরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে পার্থিব জননীও প্রত্যক্ষ দেবী—ঈশ্বরী বলিয়া পরিগণিতা হন, যেখানে শৈশবকাল হইতেই মানুষ শিক্ষা করে যে, সহস্র পিতা অপেক্ষাও শ্রদ্ধা ও সম্মানে মাতা গরীয়সী—'সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।' (Swami Abhedananda: *Divine Heritage of Man*-পুস্তকেও pp. 106 এবং 93 দ্রষ্টব্য)।

১৫। হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে স্ত্রীলোকের সম্মান যে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আছে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। যজ্ঞবেদী, উপাসনা, গৃহকর্ম সকল বিষয়েই নারীজাতির অধিকারকে বেদে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। ঋক্ ৪।৩৩।১৯-তে বলা হইয়াছে: 'স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ'—যজ্ঞে স্ত্রীলোকও ব্রহ্মা হইতে পারিত। ব্রহ্মা অর্থে যজ্ঞকালে সর্ববেদীয় ঋত্বিকদের ভুল-ভ্রান্তি দেখাইবার বা সংশোধন করিবার জন্য সর্বোপরি প্রধান ঋত্বিক্। যজ্ঞকালে স্ত্রীলোকের স্থান থাকিত দক্ষিণদিকে: 'শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা' (অত্রিসংহিতা ১৩৮)। স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের যজ্ঞে অধিকার ছিল না; এজন্য ত্রেতাযুগেও দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রকে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করিতে হইয়াছিল।

বেদের অধিকার পরে বা সর্বতোভাবে তন্ত্রে রক্ষিত হইয়াছে বলা যায়। তন্ত্রে স্ত্রী আরাধ্যা পূজ্যাশক্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে সকল কিছু নিয়মবিধির গণ্ডী হইতে নারীদের নির্মুক্তা করা হইয়াছে: 'নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন' (বীরতন্ত্রে)। অধ্যাত্ম জগতেও 'কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাম্' (তন্ত্রসারে)। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীদের কি কুমারী, কি যুবতী বা প্রবীণা সকলকেই দেবীরূপে চিন্তা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন কুমারীপূজায় দেখা যায়: 'তত্র কুমারীমানীয় * * দেবীবুদ্ধ্যা।' তন্ত্রে এমন কি '* * নিজকন্যা, অনুজা, অগ্রজা, মাতুলানী বা মাতা, তৎসপত্নিকা' সকলে 'মদংশা'— আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ বলিয়া পূজিতা। নারীপূজা ব্যতীত অর্চনাই তন্ত্রে সিদ্ধ হয় না: 'ন পূজয়তি চেৎ কান্তাং তদা বিঘ্নৈর্বিলিপ্যতে।'

প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে জাতিবিচার নাই, সেখানে 'স্ত্রীশূদ্রাণাং হোমাধিকারঃ' পর্যন্ত দেখা যায়। তবে স্মৃতিতে 'স চ ব্রাহ্মণদ্বারা'— হোমকার্যে মুখ্যভাবে নারীর অধিকার নাই, কিন্তু গৌণভাবে ব্রাহ্মণের সহায়ে আছে—একথাগুলি আরও পরবর্তীকালে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রসারে উল্লিখিত নারায়ণকল্প এবং গোবিন্দভট্ট উদ্ধৃত পরাশরভাষ্যে 'প্রণবাদিশ্চ যো মন্ত্রো ন স্ত্রীশূদ্রে প্রশস্যতে। ইতি সর্বস্ত্রীণাং শূদ্রবদ্ব্যবহারঃ।' অথবা 'সর্বত্রং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়ৎ, স মৃতোঽধিগচ্ছতি'—কথাগুলিও পরবর্তীকালে সামাজিক বন্ধনের চাপে পড়িয়া ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। নচেৎ দেখা যায়, তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী নিজেই বলিয়াছেন: 'মদংশা যোষিতা মতাঃ'—নারীমাত্রেই আমার অংশ বা প্রতিমূর্তি, 'কুমারিকা হ্যহং নাথ সদা ত্বং হি কুমারিকা',—হে সদাশিব, সমস্ত কুমারী তোমার ও আমার

অংশ। নারী অর্ধনারীশ্বরের প্রতিচ্ছবি, 'কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা' এবং কন্যা বা কুমারীপূজা করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারাই সন্তুষ্ট হন: 'ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চারুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। তে তুষ্টাঃ সর্বতুষ্টাশ্চ যস্ত কন্যাং প্রপূজয়েৎ।' এই কুমারীরা বয়সানুসারে সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুব্জিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, পীঠনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামে তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত।

স্ত্রীলোকের গুরু হইবার অধিকারও তন্ত্রশাস্ত্র দিয়াছেন, যেমন: 'সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা। গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি' (তন্ত্রসার ১'৭৪)। বেদ ও তন্ত্রের সম্মান পরে প্রাচীন সংহিতাকারগণ রক্ষা করিয়াছেন, যেমন মনুই বলিয়াছেন: "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" কিন্তু আরও পরবর্তী স্মৃতিকারগণ স্ত্রীলোকের সে-উচ্চ সম্মানকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং খর্ব করিয়াছেন। বেদপাঠ ও ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও নারীরা বঞ্চিতা হইয়াছেন—'স্ত্রীশূদ্রো দ্বিজবন্ধুনাং ন ত্রয়ী শ্রুতিগোচরাঃ।' পরাধীনতার সকল রকম শৃঙ্খলই যেন পরবর্তীকালে স্ত্রীলোকদিগের হস্তে তাঁহারা পরাইয়া দিয়াছেন।

১৬। ঋগ্বেদের যুগে রোমশা (ঋক্° ১'১২৬' ১-৭), লোপমুদ্রা (ঋক্° ১'১৭৯' ১-৬), বাক্ (ঋক্° ১০'১২৫' ১-৮); ঘোষা (ঋক্° ১'১১৭, ১০'৩৯) প্রভৃতি ব্যতীতও সূর্যা (ঋক্° ১০'৮৫), বসুকরপত্নী ঋক্° ১০'২৮'১), ইন্দ্রানী (ঋক্° ১০'৮৬' ২-২২), ইন্দ্রজননী (ঋক্° ১০'১৫৩), জুহু (ঋক্° ১০'১০৯), শ্রদ্ধা কামায়ণী (ঋক্° ১০'১৫১), সর্পরাজ্ঞী (ঋক্° ১০'১৮৯), মমতা (ঋক্° ৬'১০) যমী (ঋক্° ১০'১০;

১০·৯৫), উর্বশী (ঋক্‌· ১০·৯৫· ২-১৮) প্রভৃতি বিদুষী ও মন্ত্রদ্রষ্ট্রী নারীঋষিদের নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অদিতি, সীতা, ঊষা, রাত্রী, ইলা, সরস্বতী, ভারতী, সিণীবালী গঙ্গু, সরযু, রাকা, বৃহদ্দিবা, সুনৃতা, পুরন্ধ্রী, ধীষণা, অসুমতী, নিঋতি, অনুমতী, অরমতী, দম্বতি, পৃশ্নী, অরণ্যানী, বরুণানী, অগ্নানী প্রভৃতি ঋগ্‌বেদের দেবী, নারীঋষি ও মন্ত্রদ্রষ্ট্রী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে।

১৮। এখানে বীরনারী চাঁদবিবির কথাও আমাদের মনে পড়ে। মোগলসম্রাট আকবর যখন আহমদনগর দুর্গ আক্রমণ ও অবরোধ করেন তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধা এই নারী সমগ্র মোগল সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে পাশ্চাত্য দেশে চাঁদবিবির সহিত একমাত্র তুলনা করা চলে বীরযোদ্ধা নারী জোয়ান অফ আর্কের (Joan of Arc) সহিত।

১৯। খৃষ্টান্‌ বাইবেলের মতে, সৃষ্টির প্রথমা নারী ইভ (Eve) অমৃতের জগতে দুঃখের ও অশান্তির বিষ বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রথমসৃষ্ট পুরুষ আদম (Adam) স্বর্গে ছিলেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে, শয়তানের প্ররোচনায় ইভ তাঁহাকে টানিয়া আনিলেন পৃথিবীতে। যত পাপ, দুষ্কৃতি ও কলঙ্কের বোঝা নারীই পৃথিবীতে মাথায় করিয়া আনিয়াছে!

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই আদম ও ইভের একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা তাঁহার *'Who is the Saviour of Souls'* পুস্তিকার (পৃ° ১৫-১৬) উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: 'অজ্ঞানের আবরণে ঈশ্বর যে জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এই উদাহরণটি ওল্ড

টেষ্টামেণ্ট (Old Testament) আদমের স্বর্গ হইতে পতনের গল্পরূপে লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃতপক্ষে আদম চৈতন্যের মূর্ত প্রতীক ও ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, শয়তান অজ্ঞান। বেদান্ত যাহাকে অবিদ্যা বলিয়াছে সেই অজ্ঞানের সম্মোহনী শক্তিতে ইভ বা বুদ্ধি অভিভূতা হইয়াছিলেন। শুদ্ধস্বরূপ বা আত্মারূপী আদম সেই ইভ বা বুদ্ধির সহমিলনে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছেন, অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য আপনার দিব্য ও শুদ্ধ স্বভাবকে বিস্মৃত হইয়া স্বার্থপর জীবরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।'

তাঁহার '*Lectures at Jamshcdpur,*' (p. 42) পুস্তকে এ-বর্ণনাটী তিনি আরও একটু অন্যভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : 'আদম সত্যই ছিলেন কি-না তাহা এখনও সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই। ইডেন উদ্যান (Garden of Eden) যে কোথায় তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ বলেন, তাহা পারস্যে, কেহ বলেন, সিংহলে (Ceylon), আবার কেহ বা বলেন, উত্তর মেরুতে, সুতরাং প্রকৃতই যে ইডেন উদ্যান কোথায় তাহা আমরা জানি না। * * কিন্তু সার্বজাতিক ধর্মের মূলতত্ত্ব অনুশীলন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, এ' সমস্ত উপকথা ও কাহিনীমাত্র, সুতরাং অসার, একমাত্র সারবস্তু হইতেছে, আপনারা যে ঈশ্বরের সন্তান—আপনারা যে সকলেই ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছেন এবং ঈশ্বরেই পুনরায় ফিরিয়া যাইবেন—ইহা উপলব্ধি করা। এরূপ উপলব্ধিতে আপনাদের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবে এবং জীবত্ব হইতে দেবত্বের সিংহাসনে আপনারা আরূঢ় হইবেন!'

২০। পতি ও পত্নী একে অন্যের প্রতি অসদাচরণ করিলে

হিন্দুসমাজ তাঁহাদের জন্য কিরূপ কঠোর ব্যবস্থার বিধান করিয়াছে তাহা কৌটিল্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' ৩য় অধি° ৫৯ অ° দ্রষ্টব্য।

২১। মনু° ৫ অ° ১৩০

২২। মনু° ৩ অ° ৫৫

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (১·৮২) উল্লেখ আছে: 'ভর্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতি-শ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ। বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ॥' ইহা ছাড়া দক্ষসংহিতায় (৪·১-২) পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে: 'পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং *। তয়া ধর্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে॥' অর্থাৎ পুরুষের পত্নী এ-সংসারে একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার সহায়তায়ই পুরুষ জীবনে ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ করিয়া থাকেন।

২৩। মনু° ৩ অ° ৫৬, ২৪। মনু° ৩ অ° ৫৭

২৫। মনু° ৮ অ° ২৮, ২৬। মনু° ৮ অ° ২৯

২৭। মনু° ৩ অ° ৫২, ২৮। মনু° ৮ অ° ৩৪৯,

২৯। মনু° ৪ অ° ১৮৫, ৩০। মনু° ২ অ° ১৩১

৩১। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন: 'In India, the wife of a spiritual teacher is regarded as a living goddess' অর্থাৎ হিন্দুমাত্রেই ভারতে গুরুপত্নীকে মূর্তিমতী ঈশ্বরী বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা একটু অন্যভাবে বলা হইয়াছে, যেমন: 'পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলস্তথা। * তং গুরুং সমুপাসয়েৎ', 'স্ত্রীয়া দীক্ষা শুভ প্রোক্তা', এবং 'গুরুবত্তৎসুতাদিষু' প্রভৃতি।

৩২। মনু° ২ অ° ১৩৩ ৩৩। মনু° ২ অ° ১৪৫

৩৪। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (১'৩৫) উল্লিখিত আছে: 'এক-দেশমুপাধ্যায়ঋত্বিগ্‌যজ্ঞকৃদুচ্যতে। এতে মান্যা যথাপূর্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥' মনুর ঐ (২'১৪৫) শ্লোকে 'আচার্য'-শব্দের অর্থ ভাষ্যকার মেধাতিথি করিয়াছেন: 'ইহাচার্যোনৈরক্তদর্শনেনাধ্যাপকঃ,' অর্থাৎ 'সংস্কারমাত্রেণাচারোপদেশমাত্রেণ চাভিপ্রেত আচার্য আচারং গ্রাহয়তীতি', —আচারমাত্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক; কাজেই তিনি 'ইহ চাচার্যাৎ পিতুরাধিক্যমুচ্যতে *। নৈষ দোষঃ', অর্থাৎ মনু যে আচার্য অপেক্ষা এখানে পিতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহাতে দোষ নাই। টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এইজন্য বলিয়াছেন: 'অত্র উপনয়নপূর্বকসাবিত্রীমাত্রাধ্যাপয়িতা আচার্যোঽভিপ্রেতঃ তমপেক্ষ্য পিতুরুৎকর্ষঃ।' নচেৎ তৎপরবর্তী শ্লোকে মহর্ষি মনু স্বীকার করিয়াছেন: 'উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা। ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥' (২'১৪৬), অর্থাৎ জন্মদাতা ও সমগ্রবেদের উপদেষ্টা উভয়েই পিতৃপদবাচ্য। তবে দুইজনের মধ্যে উপদেশক আচার্য পিতাই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি যে-অধ্যাত্ম জন্ম দান করেন তাহাতে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে পরম নিত্যবস্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এখানে মেধাতিথির কথাও তাই: '* তৌ দ্বাবপি পিতরৌ তয়োঃ পিত্রোর্গরীয়ান্ পিতা যো ব্রহ্মদঃ। অতঃ পিত্রাচার্যসমবায়ে আচার্যঃ প্রথমমভিবাদ্যঃ।' কুল্লূকভট্ট সে-কথার অনুবর্তনে স্বীকার করিয়াছেন: জনকাচার্যৌ দ্বাবপি পিতরৌ জন্মদাতৃত্বাৎ। তয়োরাচার্য-পিতা গুরুতর। * * ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলকত্বাৎ ॥'

বাস্তবিক পিতা শরীরের জন্মদাতা, কিন্তু আচার্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন। পিতা যে-শরীরের জন্মদান করেন তাহা সাধন, জ্ঞান বা ভগবদ্‌প্রেম লাভ করিবার উপায়স্বরূপ বা 'Temple of God',

কিন্তু আচার্য সে-সকলকেও অতিক্রম করিয়া চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যুপাশ ছিন্ন করিবার মহামন্ত্র দান করেন এবং মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। সংসার যিনি দেখান এবং অমৃতত্বের দিগ্‌দর্শন করেন এ-দু'জনের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠদের মতে শেষোক্ত অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুদাতা আচার্যই শতগুণে কেন, সহস্রগুণেই শ্রেষ্ঠ। সংসারে ভোগই মানুষের পরম পুরুষার্থ নয়, স্থূলশরীর ভোগেরও বটে, আবার ত্যাগপথযাত্রারও অবলম্বনস্বরূপ, কিন্তু অবলম্বন বা উপায় তো আর মনুষ্যজীবনের কাম্য বা লক্ষ্যবস্তু নয়? কাম্য বা লক্ষ্য সম্পূর্ণ মুক্তি বা জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞানলাভের উপায় আচার্যই একমাত্র দিতে পারেন, এজন্য হিন্দুশাস্ত্র এই জ্ঞানদাতা আচার্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন সংসারে দিয়াছেন। যেমন জ্ঞানার্ণবে দেখা যায়: 'শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ। গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে ॥' (তন্ত্রসার ১'১০)। ইহা ছাড়া শ্রীক্রমে বলা হইয়াছে: জন্মদাতা ও জ্ঞানদাতা এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানদাতাই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং পিতা অপেক্ষাও গুরু অধিক মাননীয়: 'উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা। তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥' (—তন্ত্রসার ১'১৪)।

৩৫। মনু° ৫ অ° ১৬০ ৩৬। মনু° ৩ অ° ৬০

৩৭। মনু° ৯ অ° ২৮ ৩৮। মনু° ৯ অ° ১০১

৩৯। মহাভারত (বর্ধমান স°), আদিপর্ব ৭৪ অধ্যায় ৩৯-৪৬ শ্লো°। মহাভারতের এই ১'৭৪'৩৯-৪৬ শ্লোকে নারীজাতির প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ মহাভারতের অনুশাসনপর্ব ৩৮ অধ্যায় ১১-৩০ শ্লোকে এবং ৩৯ অধ্যায়ের ৫-৮ শ্লোকেই আবার নারী-জাতির নিন্দাও দেখান হইয়াছে। যেমন: 'পঞ্চচূড়োবাচ। কুলীনা

রূপপত্যশ্চ নাথবত্যশ্চ যোষিতঃ। মর্যাদাসু ন তিষ্ঠন্তি স দোষঃ স্ত্রীষু নারদ॥ কিঞ্চিদন্যদ্বৈ পাপীয়স্তরমস্তি বৈ। স্ত্রিয়ো মূলঞ্চ দোষাণাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ॥ সমাজ্ঞাতনৃদ্ধিমতঃ প্রতিরূপান্ বশে স্থিতান্। পতীনন্তরমাসাদ্য নালং নার্যঃ প্রতীক্ষিতুম্॥' ৩৮ অ° ১১-১৩॥ এবং পুনরায় 'এতা হি রমমাণাস্তু বঞ্চয়ন্তীহ মানবান্। ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ। গাবো নবতৃণানীব গৃহ্নন্ত্যেতা নবং নবম্॥ শম্বরস্য চ যা মায়া মায়া যা নমুচেরপি। বলেঃ কুম্ভীনসেশ্চৈব সর্বাস্তা যোষিতো বিদুঃ॥'—৩৯ অ° ৫-৬।

ইহা ছাড়া মনুস্মৃতিতেও যেমন 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে *' (মনু° ৩·৫৬-৫৭) প্রভৃতি কথা বলিয়া নারীর স্তুতি দেখা যায়, তেমন ঐ মনুতে আবার 'শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবং। দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥' (—মনু° ৯·১৭) প্রভৃতি শ্লোকে নারীর নিন্দাও পাওয়া যায়। এজন্য স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar) তাঁহার *Social History of India*-প্রবন্ধে নারীজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন (Vide *Collected Works, Vol. II, pp. 461-462*) : বেদ এবং ব্রাহ্মণের যুগে নারীজাতির উপর যে-শ্রদ্ধা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সংহিতার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে তাহা সত্যই লুপ্তপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪০। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar) তাঁহার *Social History of India* প্রবন্ধে (Vide *Collected Works, Vol. II, pp.461-462*) নারীজাতির প্রতি অসম্মানের ভাব কখন্ হইতে আসিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: ঠিক ঠিক সংহিতার যুগ হইতে হিন্দুসমাজে

নারীজাতির প্রতি অসম্মানের ভাব প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। যেমন তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখা যায়, নারীর বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিতা করার চেষ্টা হইয়াছে। নিরুক্তকার যাস্ক সেই তৈত্তিরীয়সংহিতার নির্দেশের পক্ষে ও বিপক্ষে দুইরকম ভাবে অভিমত দিয়াছেন: 'One agreeing with this, and another to the effect that they can inherit.' এজন্য স্যর ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন: 'Women began to suffer in the estimation of men about the time of Yaska,'—অর্থাৎ আর এক দিক দিয়া বলিতে গেলে যাস্কের সময় হইতেই প্রায় নারীজাতি সমাজে যথার্থভাবে শ্রদ্ধালাভ হইতে কখনও কখনও বঞ্চিতা হইয়াছেন। তাহার পর মনুস্মৃতির প্রণয়ন (খৃষ্টীয় ৪ শতাব্দী) ও মহাভারতের পুনর্লিখনের (*'retouched'*) পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পাশে ক্ষুণ্ণতার ভাবও সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধযুগের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধসাহিত্যে এরূপ নারীজাতির প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধরমণী'-পুস্তকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যেমন সংযুক্তনিকায়ে (খ° ১ পৃ° ৩৭) দেখা যায়, নারীজাতিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে: 'সদ্‌গৃহস্থ বধূরা বিশেষভাবে পতির অনুরাগিণী হন। তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি পতির জন্য বিসর্জন দিতে কখনও দ্বিধা করেন না এবং প্রিয়তমের সেবার জন্য যে-কোনও রকমের দুঃখ তাঁহারা হাস্যমুখে বরণ করেন, সেইজন্য ভার্যাকে পরম সখী বলা হয়।' সম্বুল-জাতকে

(সং ৫১৯) পতিব্রতা রমণীর আদর্শ চরিত্রসম্বন্ধে এবং কক্কটা-জাতকে (সং ১৯৪, সং ২৩৪, সং ২৩৯, সং ২৬৭, সং ২৮১) নারীর পাতিব্রত্যের কথা উল্লিখিত আছে। 'ইত্থি ভণ্ডানম্ উত্তমম্'—নারীই শ্রেষ্ঠ সম্পদ এরূপ কথার উল্লেখও জাতকে পাওয়া যায়। 'দীঘনিকায়' গ্রন্থের 'মহাসুদস্সন সুত্তন্তে' ভগবান বুদ্ধ নিজেই নারীদের 'যে নারী সুদর্শনা, শ্রীমন্ত * ইত্থিরত্ন—স্ত্রীরত্ন' বলিয়াছেন। ললিতবিস্তরেও (পৃ° ১৭) নারী চরিত্রের সুখ্যাতি আছে (বৌদ্ধরমণী পৃ° ৪৬-৫০, এবং ৭৫-৯৬ দ্রষ্টব্য)।

ইহা ছাড়া নারীচরিত্রের নিন্দাও বৌদ্ধসাহিত্যে যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যায়। যেমন, Fausboll: *Kunala Jataka, V, (pp. 434-435)*-তে অসংচরিত্রা নারীকে চিনিবার ২৫টী বিভিন্ন উপায়ের কথা উল্লেখ আছে। Fausboll: *Jataka, V, 433*-তে ৯টী কারণে স্ত্রীলোকদের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। জাতক সং ১৩০, সং ৪১৭, সং ৪৪৬, কুল্লপদুম-জাতক সং ১৯৩, বিনয়গ্রন্থ ৩খ° ৩৪৫ সংখ্যায় নিন্দনীয় নারীচরিত্রের পরিচয় আছে। অশ্বঘোষ তাঁহার 'সৌন্দরনন্দকাব্য'-এর ৭ম সর্গ ২৪ শ্লোকে এবং ৮ সর্গে নারীচরিত্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'রমণী তাহার বিলাস * অহঙ্কার * মোহকরী শক্তি ও বাক্যের দ্বারা দেবতা, রাজা দেবতা, রাজা এবং ঋষিকেও জয় করিতে পারে। * তাহারা পরের নিন্দা করিতেই ভালবাসে। * * অর্থ লালসায় স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করে * * 'প্রভৃতি। জাতক ৫১৯ সংখ্যায় বলা হইয়াছে: 'স্ত্রী-চরিত্রকে সহজে বোঝা যায় না। সমুদ্রে মাছের গতির মত তাহারা দুর্বোধ্য। * 'সচ্চম্ সুদুল্লভম্'—তাহারা কখনও সত্যকথা বলে না।' মৃদুপাণি-জাতক, গহপতি-জাতক সং ১৯৯, উচ্ছিষ্টভত্ত-জাতক সং ২১২, দুরাজান-জাতক সং ৬৪, বন্ধনমোক্ষ-

জাতক সং ১২০ প্রভৃতিতে নারীচরিত্রের নিন্দা আছে। 'ইত্থিয়ো অসাতা নাম'—নারী লাম্পট্যের অবতার প্রভৃতি শব্দও নারীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যে ভাল ও মন্দ অনুযায়ী বহুরকম ভাবে নারীদের বিভক্ত করা হইয়াছে এবং এমন কি ভগবান বুদ্ধকেও দেখা যায়, তিনি নারীচরিত্রকে স্বয়ং সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিস্তৃত আলোচনা ডাঃ বিমলাচরণ লাহা প্রণীত 'বৌদ্ধরমণী' পৃ° ৭৬-৮১ দ্রষ্টব্য।

৪১। আমেরিকান্ পরিব্রাজক মার্ক টোয়েন লিখিয়াছেন: 'পাশ্চাত্য সমালোচকগণ হিন্দুদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, সেখানে কিন্তু আমি ইউরোপীয় কোনও কোনও দেশের ন্যায় তাহাদের নারীকে হালের গরু অথবা গাড়ী-টানা কুকুরের সহিত জুড়িয়া দিতে দেখি নাই। ভারতে আমি কখন কোনও রমণী বা বালিকাকে চাষের কাজ করিতে দেখি নাই।' (স্বামী বিবেকানন্দ: ভারতীয় নারী, পৃ° ১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)।

৪২। Mill: *History of India, Vol. I, p. 248.*

৪৩। লুথারের (M. Luther) সময়ে পাশ্চাত্য বিবাহ-নীতির ধারণাও অনেক পরিমাণে উন্নত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লুথার যখন ক্যাথলিক চার্চের প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রটেস্টাণ্ট ধর্মমত (Protestantism) প্রচার করিতে থাকেন, তখন খৃষ্টধর্মে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। জার্মান মনীষী অটো ফ্লাই-ডারার (Otto Pfleiderer) তাঁহার *Philosophy of Religion,* (*Vol. III, pp. 227-230 & Vol. IV, p. 265*) পুস্তকে এই সম্বন্ধে

আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'Now marriage was recognised as the true spiritual order, much more sacred and more pleasing to God than the life of the cloister.'—অর্থাৎ মার্টিন্ লুথারের সময়ে দেখা যায়, ধর্মমতে সকল-কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক বিবাহপ্রথাও দৈহিক সুখসম্ভোগের সংকীর্ণ ধারণাকে অতিক্রম করিয়া ভগবন্মুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ডাঃ ফ্রাইডারার অবশ্য সেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ 'arose out of the felling of the Germanic people's' এবং 'German reformation' বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ধর্মের সংস্করণ-যুগের পূর্বে খৃষ্টানসমাজে ও ধর্মজগতে যে-পঙ্কিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া মনীষী লরেন্স স্বীকার করিয়াছেন: 'Much evil had followed from the granting of marriage dispensation;' (বিস্তৃত বিবরণ R. V. Lawrence: *The church and Reform* -প্রবন্ধ (*The Cambridge Modern History, Vol. II, Ch. XVIII, p, 643* দ্রষ্টব্য)। সংস্করণের যুগে লুথার তাঁহার *Address to the Christian Nobility of of the German Nation (1520)* প্রবন্ধে তাই ধর্মযাজকদের বিবাহসম্বন্ধে ('clerical marriages') উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন: ' * * I say that these two (who are minded in their hearts to live together always in conjugal fidelity) are surely married before God.' (vide Lindsay: *The History of Reformation Vol. II, p.*

37)। এজন্য মনীষী লিনড্সে (T. M. Lindsay) স্বীকার করিয়াছেন: 'His (Luther's) strongest denunciations were reserved for the practice of celibacy; he dwelt on the divine institution of marriage, its moral and spiritual necessity,' (Ibid, *Vol. I. pp 312-313*). শুধু তাই নয়, মনীষী এ. এফ্ পোলার্ড (A. F. pollard, M. A.) তাঁহার *National Opposition to Rome in Germany* প্রবন্ধে (Vide *The Cambridge Modern History, Vol. II, Ch. V, p, 162*) স্বীকার করিয়াছেন: "* * but women as well—so declared Mathew Zell, in grateful recognition of the effective and which women occasionally rendered to the cause of Reform.'—অর্থাৎ সংস্করণের জন্য নারীজাতিও ধর্মে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

৪৪। হিন্দুর বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে: 'কন্যাদানস্তু তত্তদ্দেবতা প্রীতয়ে *। বস্তুতস্তু তত্তদ্বর্য়ীয়ায়াঃ কন্যায়াস্তত্তদ্বুদ্ধ্যা শিবরূপত্বং সম্প্রদানীয়ে বিভাব্য দত্যাদিতি রহস্যার্থঃ,' (তন্ত্রসার)। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম' (*Human Affection and Divine Love, p. 19*) নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে এই আদর্শসম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'পতি যে তাঁহার পত্নীকে ভালবাসেন, পতির কর্তব্য পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছেন সেই আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে

ভালবাসা, এবং পত্নীরও উচিত তাঁহার প্রিয়তম পতির মধ্যে সেই আত্মাকে ঐকান্তিকভাবে পতিরূপে ভালবাসা। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভালবাসিবেন এবং এই অপার্থিব আদর্শই তাঁহাদের বিবাহ-জীবনের বা মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় তাঁহার '*Leaves from My Diary*'-পুস্তকে (*পৃ° ১২) এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'হিন্দুরা পত্নীকে তাঁহাদের অধ্যাত্মপথের সহগামিনী বলিয়া মনে করেন। * * * দুইটী আত্মার মধ্যে পবিত্র যোগসূত্র রচনা করাই বিবাহের যথার্থ উদ্দেশ্য। কেবল ঐন্দ্রিয়িক সুখ-পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ-রূপ পার্থিব মিলন নয়। অপার্থিব মিলনে মনোমালিন্য, স্বার্থপরতা এবং বলপূর্বক বা আইনের আশ্রয়ে কোন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা একেবারেই নাই।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'একটি পবিত্র নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাঁহাদের এক সর্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা,—একি কৌতুক? একি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থ? হিন্দু বলে, 'না না, কখনই না।' (ভারতীয় নারী, পৃ° ৯ দ্র°)। পাশ্চাত্য বিদুষী মহিলা ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গীও এ-বিষয়ে অতিশয় উচ্চ ও পবিত্র ছিল! তিনি বলিয়াছেন: 'Both husband and wife must set their faces towards the welfare of the family. This, and not that they should love each the other before all created beings, is the primal intention

of marriage. Yet for the woman supreme love also is a duty.' (Vide Nivedita : *The Web of Indian Life, pp. 32-33*).

ডাঃ স্তর রাধাকৃষ্ণন্ মিঃ বি. এস্. উপাধ্যায়ের '*Women in Rigveda*' পুস্তকের পূর্বাভাসে এই হিন্দুবিবাহের আদর্শসম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন : 'Marriage is not to be regarded as a temporary association to be dissolved at the fancy of the parties. * * To look upon husband and wife as complementaries which make up a whole is the true implication of married life.' শ্রদ্ধেয় রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার 'কমলা-লেক্‌চারস' *Religion and Society* পুস্তকেও এসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার সুবিখ্যাত *Human Affection and Divine Love*-পুস্তকে (পৃ° ১৭-১৮) জার্মাণ মনীষী Otto Weininger-র অভিমত (Vide Otto Weininger : *Sex and Character, p. 247*) এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য। W. B. Selbie তাঁহার *Psychology of Religion*-পুস্তকে (পৃ° ৯৮-৯৯) বিবাহ-জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে Westermarck (Vide E. Westermarck : *The History of Human Marriage*) প্রভৃতির মত উল্লেখ করিতে গিয়াও স্বীকার করিয়াছেন : ' * * in which care must be taken not to offend the unseen powers.' মিঃ উপাধ্যায়ও তাঁহার *Women in Rigveda*-গ্রন্থে (পৃ° ৪৭) এ-সম্বন্ধে Hartley-র মতবাদ (Vide C. Gasquione Hartley : *Women, Children,*

Love and marriage) উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন : 'No longer must marriage be regarded solely as a personal relationship. Marriage is a religious duty.' আলটেকরও তাঁর *The Position of Women in Hindu Civilisation* বইয়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

৪৫। মনুও (১·৮২) বলিয়াছেন : 'সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ।' কৌটিল্যও (প্রক° ৫৯) উল্লেখ করিয়াছেন : 'পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।' যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাও ১·৭৩ দ্রষ্টব্য।

৪৬। বিবাহবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে ঋগ্বেদের সময় হইতে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যায়। ঋক্‌বেদের সময়েই দেখান যাইতে পারে যে, পরিণতবয়স্ক বালিকা ও বিধবাদের বিবাহ তখনও প্রচলিত ছিল। নারীদের পছন্দমত পতি বাছিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার সমাজে তখন বর্তমান ছিল। মিঃ বি. এস্. উপাধ্যায় তাঁহার *Women in Rigveda* (*1941*) পুস্তকে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক ঋক্‌বেদ হইতে নজির দেখাইয়াছেন যে, কুমারীরা স্বাধীনভাবে বৈদিক সমাজে মেলামিশা করিতে পারিত (ঋক্° ৪·৫৮·৮, ৬·৭৫·৫, ৭·২·৫, ১০.৮৬·১০) এবং পতির সহিত কুমারীরা স্বাধীনভাবে বিহার করিত (অথর্ব° ২·৩৬·১, ঋক্° ৭·২·৫, ৪·৫৮·৮)। তবে এ-স্বচ্ছন্দতা যে পরে কিছু মন্থর হইয়াছিল এই ইঙ্গিতও আবার ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়, কেননা পিতা অবর্তমানে ভ্রাতার সহিত কুমারীরা পতিনির্বাচনে গমন করিত, কন্যার পিতা বা ভ্রাতা হইতেন উপলক্ষ্য বা অবলম্বন, যেমন 'অভ্রাতেব পুংস এতি' (ঋক্° ১·১২৪·৭, অথর্ব° ৬·৬১·১)। কিন্তু বিবাহ যে তাহাদের পরিণত

বয়সে হইত ইহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় (ঋক্° ৭·৫৫·৮), অথবা দেখা যায়ঃ 'নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্' (ঋক্° ৩·৫৫.১৬), অর্থাৎ অপরিণত বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে নিষেধ করা হইতেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সামবেদীয় তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যোপনিষদে (১·১০·১) বাল্যবিবাহের একটী নিদর্শনও পাওয়া যায়, যদিও তাহাকে ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্তীকালেই অবশ্য বলা চলে। যেমনঃ 'মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হচাক্রায়ণ ইভ্যাগ্রামে প্রদ্রাণক উপাস।' অর্থাৎ এখানে চক্রপুত্র উষস্তি ঋষির বালিকা-পত্নীর সহিত ইভ্যা গ্রামে যাওয়ার কথা পাওয়া যায়। আচার্য শংকর এই 'আটিক্যা সহ' শব্দের অর্থ করিয়াছেনঃ 'অনুপজাত. পয়োধরাদিস্ত্রীব্যঞ্জনয়া সহ জায়য়া', অর্থাৎ অনুদ্ভিন্নস্তনাদি বালিকা পত্নী সহ। কাজেই ইহা হইতে মনে করা অসমীচীন হয় না যে, ছান্দোগ্যের সময় কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ অবশ্য প্রচলিত ছিল, অন্যথা উষস্তি ঋষিসমাজে থাকিয়া অপরিণতবয়স্ক কন্যা কখনই বিবাহ করিতে পারিতেন না। তবে মিঃ উপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন (পৃ° ৫১), ঋগ্বেদে কন্যা, কানীনকা ও কন্যনা-শব্দ নারী, কুমারী ও যুবতীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত (ঋক্° ১০·৬১·৫, ৪·৩২·২৩, ১০·৪০·৯ এবং ঋক্° ৮·৩৫·৫, ৯·৯৬·২০)। তাহার পর যোষা, যোষণ, যোষণা ও যোষিৎ-শব্দও বিবাহযোগ্যা পরিণত কুমারীকেই বুঝাইত (ঋক্° ১·১১৭·২০, ৪·৫·৫, ৩·৫২·৩, ৩·৯৫·৪ এবং ৯·২৮·৪)। ঋক্‌বেদে যে বিশ্বাবসু-সূক্ত আছে (ঋক্ ১০·৩৪·৫) তাহাতেও পরিণত বয়স্ক অবিবাহিত কুমারীর কথা উল্লিখিত আছে (ঋক্° ১·৫১·১৩, ২·১৭·৭,

১০·৩৯·৯, ১·১১৭·৭)। ঋগ্বেদের কাক্ষীবান্ ঋষি রাজা ভাব্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা রোমশাকে (ঋক্° ১·৫১·১৩) এবং প্রায় বৃদ্ধ বয়সেও আবার বয়স্কা রাজকুমারী ঘোষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন '* ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং *।' (ঋক্° ১·১১৭·৭, ২·১৭·৭, ১০·৩৯·৩)। মিঃ উপাধ্যায়ের মতে তাঁহার পরই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অনুসারে বিবাহরীতি প্রচলিত হয় এবং ইহাই 'পরিবেত্তা'-রূপে পরবর্তী সংস্কৃত-সাহিত্য বাজসেনেয়সংহিতা ৩০·৯, তৈত্তিরীয় স° ৩·২·৫, কঠ উ° ২·১·২২, কৌষিতকী ৩·৫ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

ঋক্‌বেদে পরিষ্কারভাবে আবার অনুলোম ও বিলোম বিবাহের প্রচলন দেখা যায়, যেমন ১·১১৬·১০-ঋকে চ্যবানের বিবাহ সম্বন্ধে দেখা যায়: 'জুজুরুষো * * দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ। * * পতিমকৃণুতং কনীনাম্।' ১·১২২·৯-ঋকে কাক্ষীবান্ এবং ৫·৫২-৬১ সূক্তে শ্যাবাশ্ব প্রভৃতির অনুলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা অসঙ্গের সহিত অঙ্গিরা ঋষির কন্যা শাশ্বতীর প্রতিলোম বিবাহ হইয়াছিল (ঋক্° ৮·১·৩৪)। ঋষিদের সহিত পরিণতবয়স্ক দাসীকন্যাদেরও বিবাহ হইত (ঋক্° ৮·১৯·১৬, ৬·২৭·৮) এবং এই দাসীকন্যাদের 'বধূ' অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা নামে অভিহিত করা হইত 'দাসীজননী' কথার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (ঋক্° ১·১৮·১)।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও তাই। মিঃ উপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে (পৃ° ৯১-৯৫) উল্লেখ করিয়াছেন, ঋক্‌বেদে 'যুবং হ কৃশং যুবমশ্বিনা শয়ুং যুবং বিধন্তং বিধবামুরুষ্যথঃ' (ঋক্° ১০·৪০·৮), অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ ও শয়ু, হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা বিধবা ও পূজারিণীকে রক্ষা কর'—কথার উল্লেখ দেখা যায়। তবে ইহাও সত্য যে, ঋক্‌বেদে উভয় রীতির

ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যেমন, ৪'১৮'১২-ঋকে বিধবার পুনর্বিবাহ যেন রহিত বুঝাইতেছে, আবার ১০'১৮'৮-ঋকে বিধবা-বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। ১০'১৮'৯-ঋকে 'সুবীরা'-শব্দ বিধবা-বিবাহকে বুঝাইয়া থাকে। ১০'৪০'২-ঋকে 'কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ' শ্লোকটীও ইহার প্রমাণ। তাহার পর অথর্ববেদেও (৯'৫'২৮) এই বিধবা-বিবাহের উল্লেখ স্পষ্টভাবে আছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁহার 'ইণ্ডো-এরিয়ান রেসেস্' (*Indo-Aryan Races, Vol. II, p. 155*) পুস্তকে এই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: বৈদিক যুগে হিন্দুদের মধ্যে যে বিধবা-বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে বহু প্রমাণ ও যুক্তি আছে। সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রাচীনকাল হইতে 'দিধিষু' 'পরপূর্বা' ও 'পৌনর্ভব' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। যে-ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্রহণ করে তাঁহাকে 'দিধিষু' বলে, এবং যে-নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তাঁহাকে 'পরপূর্বা' বলে। 'পৌনর্ভব'-শব্দেরও সেরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানকে 'পৌনর্ভব' বলে।

স্যর ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar) বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার *Social History of India*-প্রবন্ধে এবং *Madras Reform Association Address*-এ উল্লেখ করিয়াছেন (Vide *Collected Works*, Vol. *II*, *pp. 466, 507*): 'ঋগ্বেদ ১০ম' ১৮ সূক্তে, অথর্ববেদ, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-সংহিতা প্রভৃতিতে বিধবা-বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরাশর, নারদ এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার সমর্থন আছে। স্যর ভাণ্ডারকারের কথায় বলিতে গেলে একমাত্র 'In later times the practice

began to get out of use, and in time of Manu it was restricted to a child-widow,' অর্থাৎ পরাশর, নারদ প্রভৃতি সংহিতাকারদের পরবর্তীকালে বিধবা-বিবাহপ্রথা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অচল হইতে আরম্ভ হয় এবং মনুর সময়ে তাহা বিধবা-বিবাহের স্থানে বালিকা-বিধবার বিবাহ বিধিসঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে আবার দেখা যায়. বিধবা-বিবাহ একেবারেই সমাজবহির্ভূত হইয়া দাঁড়াইছিল।

স্বতন্ত্রভাবে বৌদ্ধযুগের কথা আলোচনা করিলেও দেখা যায়, তখন বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধরমণী'-তে উল্লেখ করিয়াছেন: মহাবংসেও ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'রাজা খল্লাটাঙ্গ তাঁহার সেনাপতি কম্মহারত্তকের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বট্টগামিনী সেই সেনাপতিকে নিধন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। বট্টগামিনী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাচুলীককে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া অনুলাদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন' (বৌদ্ধরমনী পৃ° ২৪)।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধযুগে ভ্রাতা ও ভগিনীতে এবং সম ও বিসম জাতিতে বিবাহেরও প্রচলন ছিল। খুদ্দকপাঠের পরমত্থদীপনীতে এবং সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে (১খ° পৃ° ২৫৮-২৬০) দেখা যায়, রাজা ওক্কারের প্রধানা মহিষীর চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাজ্যচ্যুত হইয়া কপিলবত্থু (কপিলবস্তু) নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং চারি ভ্রাতা চারি ভগিনীকে বিবাহ করেন। মহাবংশে আছে, লাঢ়রাজ্যের রাজা সীহবাহু তাঁহার ভগিনী সীহসীবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাজকুমারী বজিরার সহিত তাঁহার পিতৃস্বসার পুত্র রাজা অজাতসত্তুর (অজাতশত্রু) বিবাহ হইয়াছিল। মগধের জনৈক গৃহস্থ মঘ তাঁহার মাতুলকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (ধর্মপদত্থকথা ১খ° পৃ° ২৭১)। আনন্দ তাঁহার পিতৃস্বসার কন্যা উপ্পলবণ্ণাকে বিবাহ করেন (ধর্মপদত্থকথা ২খ° পৃঃ ৪৯)। লঙ্কার রাজা পাণ্ডুবাসুদেবের কন্যা চিত্তার সহিত তাঁহার মাতুলপুত্র দীঘগামনির বিবাহ হইয়াছিল। সুবন্নপালী তাঁহার পিতৃস্বসার পুত্র পুণ্ডকাভয়কে বিবাহ করেন (মহাবংশ ১০ খ° ৭৮ শ্লো°)।—বৌদ্ধরমণী পৃ° ২-৬।

পুনরায় বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায়, বিবাহে জাতি বা বংশ-মর্যাদারও বিচার করা হইত না। অবশ্য অবদানকল্পলতা, বিরূঢ়কাবদান, থেরীগাথা, মহাবংশ ও জাতক প্রভৃতিতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন: কোশলের রাজা পসেনাদি শাক্য মহানামের দাসীকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়া শ্রাবস্তিতে লইয়া যান। সম্রাট অশোক বণিককন্যা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই দেবীর গর্ভে অশোকের পুত্র মহিন্দ এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্তার জন্ম হয় (মহাবংশ পৃ° ১০১)। দরিদ্রকন্যা কিসাগোতমীর সহিত এক বণিকপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল (ধর্মপদত্থকথা ২খ° পৃ° ১১৭)। বঙ্কহার প্রদেশের শিকারীদের রাজকন্যা চাপার সহিত জনৈক সাধু উপকের বিবাহ-সংবাদ পাওয়া যায় (থেরীগাথাভাষ্য পৃ° ২২০)। চণ্ডার সর্দার ত্রিশঙ্কুরের পুত্র শার্দুলকর্ণের সহিত এক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়াছিল (দিব্যাবদান পৃ° ৬২০)।—বৌদ্ধরমণী পৃ° ৯-১০।

অবশ্য সংহিতার যুগে হিন্দুদের মধ্যে যে এরূপ অসবর্ণ-বিবাহ

প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের আশ্বমেধিকা এবং অনুশাসন-পরাশরমাধ্ব (পৃ° ৪৯৫-৪৯৬) তাহার উদাহরণ। তবে ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে, ঋষি অত্রি, উতথ্য, শৌনক ও ভৃগু প্রভৃতি শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ প্রভৃতির জন্য সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, বেদ এবং ব্রাহ্মণের যুগেই (শতপথব্রাহ্মণ ১'৮'৩'৬ দ্রষ্টব্য) বিবাহের বিধি কথঞ্চিৎ নিয়মবদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও এমন কি শূদ্রের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। আবার ইহার উদাহরণ ঐ শতপথব্রাহ্মণে (৪'১'৫'৭) দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়রাজ শর্যাতের কন্যা সুকন্যার সহিত এক ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মনু° ৩'১২, যম° ১'৫৭, বশিষ্ঠ° ১'২৪-২৫ প্রভৃতি সংহিতায় উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিটি, ক্ষত্রিয়ের তিনটি এবং বৈশ্যের জন্য দুইটি পর্যন্ত বিবাহের রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্মৃতি ১৫'৪২, মনু° ৯'১৮২, বৃহস্পতি-স্মৃতি ২৫'৯০ এবং কালিকাপুরাণ ও বৃহৎপরাশরেও উল্লেখ পাওয়া যায়, এক পুরুষ বহু স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিত। বহুবিবাহ-প্রথার ইঙ্গিতও বৃহস্পতিস্মৃতি ২৭'২০ এবং আপস্তম্ব° ২'২৭ প্রভৃতিতে দেখা যায়।

পরিশেষে উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না যে, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ এবং অনুলোম-বিলোম বা ব্রাহ্মণাদি বিবাহ পৃথিবীতে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সমস্ত জাতির ভিতর সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইত। তবে ধর্মে, আচারে বা নিয়মে প্রভেদ ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা ঋগ্বেদে ও সামবেদাদিতে বিধি ও নিষেধ এই দুই রকমের উল্লেখ থাকিত না। সেজন্য যদিও শ্রদ্ধেয়

শ্রীরাধাকুমুদ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন : 'Rigvedic society was well organised. * * It was primarily monogamic, while polyandry was unknown. * * Sexual morality was very high. Incest, or marriage between father and daughter or between brother and sister, was not permitted (RV. X. 10. 10). Child marriage was also unknown, * * ' (Vide R. K., Mookerji, M. A., Ph. D.: *Hindu Civilization, pp. 72-73*), তথাপি যম ও যমী—ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ, উষস্তি ঋষির সহিত বালিকা কন্যার বিবাহ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত সামান্য হইলেও বৈদিক সমাজে যে এই সকল বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা ছাড়া পরবর্তীকালের কথাও তাই যে, বিধি ও নিষেধ দুই রকম ভাব হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন মনু° (৩·১৩) ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যাকে বিবাহ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য° (৫·৫৯) তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। মনু° (৯·৫৯-৬৯) নিয়োগপ্রথার অনুকূলে ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য° (১·৬৮-৬৯) তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই কোন নির্দিষ্ট প্রচলন চিরদিন ছিল বা একেবারেই ছিল না ইহা নথি বা পুঁথিপত্র দিয়া প্রমাণ করা সত্যই দুরূহ।

নিয়োগপ্রথার উল্লেখ কয়েকটি স্মৃতিতে, রামায়ণে ও মহাভারতে পাওয়া যায়। ডাঃ আলটেকর বলিয়াছেন, প্রাচীন স্পার্টা ও ইহুদীসমাজের মধ্যে নিয়োগপ্রথার প্রচলন ছিল। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে এই প্রথার উল্লেখ আছে। ক্লডিয়াসের সাথে হ্যাম্‌লেটের মাতার ও সপ্তম হেন্‌রীর সাথে ক্যাথারিনের বিবাহ প্রাচীন নিয়োগপ্রথাকেই

স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋগ্বেদে নিয়োগপ্রথার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (৭'৫'৭) আছে : কোন ঋষি বলিয়াছেন, নিয়োগ দ্বারা জাত পুত্র পুত্ররূপে গণ্য নয়—"ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্তি"। মহাভারতে এই নিয়োগ-প্রথাকে বিশেষভাবে সমর্থন করা হইয়াছে—"নারী তু পত্যাভাবে বৈ দেবরং কৃণুতে পতিম্" (১৩'১২'১৯)। অবশ্য বংশরক্ষার জন্য নিয়োগের দ্বারা পুত্রোৎপাদন করা হইত। মহাভারতে বেদব্যাসের ঔরসে গান্ধারী ও মাদ্রীর পুত্র লাভ ইতিহাস-বিদিত। কেবল লোভ-চরিতার্থের জন্য নিয়োগপদ্ধতি নিন্দনীয় ছিল—"লোভান্নাস্তি নিয়োগঃ" (বশিষ্ঠধর্মসূত্র ১৭'৫৭)। ডাঃ আল্‌টেকরের মতে, নিয়োগপ্রথা ৩০০ খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার পরে ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন হয়। আপস্তম্ভ, বৌধায়ন ও মনু প্রভৃতি সংহিতায় নিয়োগপ্রথাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হইয়াছে। মনু বরং ইহাকে 'পশুধর্ম' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন—"অয়ং দ্বিজৈর্হি * * পশুধর্মো বিগর্হিতঃ" (৯'৬৬)। ধর্মসূত্রকার বশিষ্ঠ ও গৌতম কিন্তু আপস্তম্ভ ও বৌধায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিধবার ইচ্ছানুসারে নিয়োগপ্রথা প্রবর্তিত হইতে পারে এবং তিনি দেবর ব্যতীত কোন আগন্তুককে কখনও বিবাহ করিবেন না। কৌটিল্য ও অবস্থা হিসাবে নিয়োগপদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া অথর্ববেদের একস্থানে বিধবাবিবাহের সমর্থন আছে—"যা পূর্বং পতিং বিত্বা অথান্যং বিন্দতে পতিম্" (৯'৫'২৯'৮)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮'৮ মন্ত্রে বিধবা-বিবাহের উল্লেখ আছে। আচার্য সায়ণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (৬'১) ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন : "ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহবতো দিধিষোঃ পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুরেতজ্জনিত্বং

জায়াত্বমভিসংবভূথ আভিমুখ্যেন সম্যক্‌প্রাপ্নুহি*। সুতরাং উল্লেখ করা সমীচীন হইবে না যে, যদিও শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাকুমুদ বাবু পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন: '* * The marriage of a widow was not contemplated, though there is a reference (RV. X. 40. 2) to the widow married to the brother of her husband's partner at religious ceremonies (VIII. 31)' (Vide Mookerji : *Hindu Civilization. p. 73*), তথাপি ইহা ঠিকভাবে সমর্থন করা যায় না। কারণ বিধবা-বিবাহ যে ঋক্‌বৈদিক যুগেও প্রচলিত তাহার উদাহরণ স্পষ্ট পাওয়া যায়।

৪৭। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে (প্রক° ৫৯) উল্লেখ করিয়াছেন: 'নীচত্বং পরদেশং বা প্রস্থিতো রাজকিল্বিষী। প্রাণাভিহন্তা পতিতস্ত্যাজ্যঃ ক্লীবোঽপি বা পতিঃ॥' ইহা ছাড়া 'পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ'-কেই কৌটিল্য বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ বলিয়াছেন। যেমন, 'অমোক্ষ্যা ভর্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্যা। ভার্যায়াশ্চ ভর্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।' —(অর্থশাস্ত্র ৩০৩)।

৪৮। মনু° (৮·৮০-৮২): 'মদ্যপাসাঽধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ। ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা॥ * * যা রোগিনী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ। সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥' যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (১·৭৩-৭৪) 'সুরাপী ব্যাধিতো ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা। স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা। অধিবিন্না তু ভর্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ॥'

বৌদ্ধসাহিত্যে স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষে এরূপ পুনর্বিবাহ এবং বহুবিবাহের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন কুণালজাতকে (সং ৫৩৬)

স্বয়ম্বরসভায় রাজকুমারী কণ্হা পাঁচজন স্বামী মনোনীত করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধরমণী'তে উল্লেখ করিয়াছেন: নক্ষত্রজাতকে (সং ৪৫) দেখা যায়, 'পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিত।' বিমানবত্থুভাষ্যে (পৃ° ১৪৯-১৫৬) ভদ্দা নাম্নী বন্ধ্যা স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহার স্বামী ভদ্দারই ভগিনী সুভদ্দার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বব্বুজাতকে (সং ১৩৭) পত্নী পিতৃগৃহ হইতে আসিতে বিলম্ব করায় স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। রুহক-জাতকে (সং ১৯১) দুশ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের উল্লেখ আছে। অস্সকজাতকে (সং ২০৭) কাশীরাজ্যের অন্তর্গত পোতালি নগরের রাজা অস্সক তাঁহার প্রথমা মহিষী উব্বরীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করিয়াছিলেন। ধর্মপদত্থকথায় (১ম খ°, পৃ° ২৬৯) দেখা যায়, মগধের জনৈক গৃহস্থ মঘ নন্দা, চিত্তা, সুধম্মা ও সুজাতা এই চারি পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাবগ্গে (৮.১.১৫) আছে, রাজা বিম্বিসারের ৫০০ পত্নী ছিল। সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে দেখা যায় (পৃ° ২৫৮), রাজা ওক্কাকের পাঁচটি মহিষী ছিল। মহাবংসে (পৃ° ১৪) রাজা শুদ্ধোদনের সহিত দুই বৈমাত্র ভগিনী মায়া ও মহামায়ার বিবাহের উল্লেখ আছে (—বৌদ্ধরমণী পৃ° ২০-২১)।

ইহাছাড়া বৌদ্ধসাহিত্যে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর জীবিতকালে বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী গ্রহণে বাধা ছিল না। আইন অনুসারেও পুরুষকে একাধিক পত্নী গ্রহণে বাধা দেওয়া হয় নাই। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রথা তখন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোনও আইন ছিল না।' থেরীগাথায় (পৃ° ২৬০) ইসিদাসী দুই স্বামীর নিকট হইতেই পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্ছঙ্গজাতকের (সং ৬৭)

ভূমিকায় স্পষ্টভাবেই আবার স্ত্রীলোকেরও পুনর্বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে (—বৌদ্ধরমণী পৃ° ২২-২৪)।

৪৯। মনীষী স্যর ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar) এই বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তাঁহার *'Age of Marriage of Girls'* এবং *'A Note on the Age of Marriage etc.'* প্রবন্ধগুলিতে (Vide *Collected Works, Vol. II, pp 462-464, 538-545, 584-602*) উল্লেখ করিয়াছেন: যে বিবাহকালে বর ও বধূ যে-মন্ত্র আবৃত্তি করেন তাহাতে কন্যার নির্দিষ্ট কোন বয়সের উল্লেখ নাই। আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি সংহিতাকারগণ তাঁহাদের গৃহ্যসূত্রে বিবাহপ্রণালীর বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কন্যার বিবাহের নির্দিষ্ট কোন কাল বা বয়স সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরুত্তর। তবে বৌধায়ন (*IV. 1. 14*) এবং বশিষ্ঠসূত্র (*XVIII. 67-68*) অনেকাংশে তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। গোভিল, গোভিলপুত্র, হিরণ্যকেশিন 'নগ্নিকা ও অনগ্নিকা'-র আলোচনা তুলিয়া নগ্নিকা বালিকার বিবাহ পাকেপ্রকারে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন, গোভিলপুত্র তাঁহার 'গৃহ্যসংগ্রহ' পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন: 'নগ্নিকাং তু বদেৎ কন্যাং যাবন্নর্তুমতী ভবেৎ। ঋতুমতী ত্বনগ্নিকা তাং প্রযচ্ছেত্ত্বনগ্নিকাম্॥' হিরণ্যকেশিন তাঁহার গৃহ্যসূত্রে যুবকের বিবাহ-নীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'সমাবৃত্ত আচার্যকুলান্মাতাপিতরৌ বিভৃযাত্তাভ্যামনুজ্ঞাতো ভার্যামুপযচ্ছেৎ সজাতানগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণীম্।' আচার্য ভাণ্ডারকার এজন্য এখানে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন: 'We have to suppose that then too she was a grown-up girl ;'—অর্থাৎ প্রাচীন সংহিতাকারদের সময়ে বিবাহ-

কালীন কন্যার বয়স পরিণত থাকিত। জৈমিনি স্বীকার করিয়াছেন, অচ্ছিন্নপত্রা পরিণতবয়স্কা কন্যাই বিবাহের বধূ হইবার উপযুক্ত।

তবে মনু কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে অনেকটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দেখা যায়। তিনি বিশেষ করিয়া কুমারীকে দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত অপরিণীতা থাকিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। গোভিল, গোভিলপুত্র অনগ্নিকার প্রশ্ন তুলিলেও অনেকাংশে কুমারী কন্যার বিবাহের নির্দেশ অনুমোদন করিয়াছেন দেখা যায়। এজন্য আচার্য ভাণ্ডারকার সেই প্রসঙ্গেও অনুমান করিয়াছেন: 'This means that the girl should be one who has reached womanhood.'

ধর্মশাস্ত্রের যুগ হইতে কুমারী-বিবাহের বিধিতে সংহিতা-কারগণের অনুমোদন যেন অনেকটা বেশী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ বশিষ্ঠ তাঁহার সংহিতায় 'প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।' প্রভৃতি কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই নজিরে নগ্নিকা অপরিণতবয়স্কা কন্যা কুমারী হিসাবে অনুমোদিত, অন্যথা 'ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি'—অনগ্নিকা হইলে পিতা পাপভাগী হইবেন প্রভৃতি নিষেধবাক্য দেখা যায়। যমসংহিতায়ও এরূপ কথার উল্লেখ আছে, যেমন "কন্যা দ্বাদশ বর্ষাণি যা প্রদত্তা বসেদ্ গৃহে। ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ * *"।

পুনরায় ইহাও দেখা যায় যে, নির্ণয়সিন্ধুকার এইসব মতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া দশ বৎসরবয়স্কা বালিকার বিবাহ বিধিসম্মত বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু মনু ও বৌধায়নসূত্র প্রভৃতিতে আছে: 'দশবর্ষাদূর্ধ্বং বিবাহো নিষিদ্ধঃ। তথাপি দাতুরভাবে দ্বাদশষোড়শাব্দে জ্ঞেয়ে রজোভাব ইদম্।'—অর্থাৎ বালিকার অভিভাবক

না থাকিলে দ্বাদশ বা ষোড়শ বৎসর-বয়স্ক বালিকার বিবাহও বিধিসম্মত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনু (৯'৯৪) বলিয়াছেন: 'ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং,'—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত বার বৎসরের কুমারীর বিবাহ বিহিত এবং টীকাকার কুল্লুকভট্ট সেজন্য স্বীকার করিয়াছেন: 'এতচ্চ যোগ্যকালপ্রদর্শনপরং, ন তু নিয়মার্থং।' মনু° (৯'৯৪) ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবকের সহিত ৮ বৎসরবয়স্কা কুমারীর বিবাহের কথাও বলিয়াছেন। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে 'শৈশবী' অর্থাৎ ৭ বৎসরের কুমারীর সহিত ১৮ বৎসরেরযুবকের, 'গৌরী' অর্থাৎ ৮ বৎসরের বালিকার সহিত ২৫ বৎসরের যুবকের, 'রোহিণী' অর্থাৎ ৯ বৎসরে কুমারীর সহিত এবং 'গান্ধারী' বা ১০ বৎসরের' বালিকার সহিত ২৫ বৎসরের যুবকের বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়। সংবর্তসংহিতায় (১'৬৬-৬৮) উল্লেখ আছে: 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলাম্॥ * * তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং * *। বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে।' অন্যথা মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'ত্রয়স্তে নরকং যান্তি'—তিনজনেই নিরয়গামী হন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে (প্রক° ৫৯) উল্লেখ করিয়াছেন: 'দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি শোড়ষবর্ষঃ পুমান্।' —অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষের কন্যার সহিত ষোড়শবর্ষীয় যুবকের বিবাহ বিহিত। তবে মহাভারতে (১৩'৪৪'১৪) আবার ২১ অথবা ৩০ বৎসরের যুবকের সহিত ১৬ বৎসরের পরিণতবয়স্কা কুমারীর বিবাহবিধির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া মনু°৯'৮৮-৮৯, বৌধায়ন° ৪'১'১১, বশিষ্ঠ° ১৭'৭০, গৌতমস্মৃতি ১৮'২১ এবং যম°, লল্লাট°, শাতাতপসংহিতা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধযুগের কথাও তাই। তবে বৌদ্ধসাহিত্যে বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত একরূপ বিরল বলা যায়। তখন ১৬ বৎসর বা ততোধিক বয়স্কা কন্যার বিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অসিলকৃখজাতকে (সং ১২৬) ১৬ বৎসর বয়স্কা রাজকুমারীর এবং ধর্মপদের অত্থকথাতে (২খ° পৃ° ২১৭) রাজগৃহের শ্রেষ্ঠিকন্যা কুণ্ডলকেশীরও ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল (—বৌদ্ধরমণী পৃ° ১° দ্র.)।

৫০। 'নত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্ ॥' —মনু° ৯.৭১

কল্লুকভট্ট উল্লেখ করিয়াছে: 'কস্মৈচিদ্বাচা কন্যাং দত্ত্বা তস্মিন্ মৃতে দানগুণদোষজ্ঞস্তামন্যস্মৈ ন দদ্যাৎ। যস্মাদেকস্মৈ দত্ত্বা অন্যস্মৈ দদৎ পুরুষানৃতং সহস্রমিত্যুক্তদোষং প্রাপ্নোতি। সপ্তপদীকরণস্যাজাতত্বাদ্ ভার্যাত্বানিষ্পত্তেঃ পুনর্দানাশঙ্কায়ামিদং বচনম্।'

৫১। মনুস্মৃতিতে (৯.৮৯) দেখা যায়, উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত কন্যাদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে: 'কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তু-মত্যাপ। ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কাহচিৎ ॥' ভাষ্যকার মেধাতিথিও স্বীকার করিয়াছেন: 'প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্ ** ন দদ্যাদ্যাবদ্ গুণবান্বরো ন প্রাপ্তঃ।' টীকাকার কুলূকভট্ট বলিয়াছেন: '** ন পুনরেনাং বিদ্যাগুণরহিতায় কদাচিৎ পিত্রাদির্দদ্যাৎ।' মনুর ৯.৯০ শ্লোকে বলা হইয়াছে: '** ঊর্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্।' স্মৃতিকার বৌধায়ন বলিয়াছেন (৫.১.১৪): '** বিন্দেত সদৃশং পতিম্।'

৫২। ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবর্ষঃ প্রজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গন্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ —মনু° ৩.২১

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। বশিষ্ঠ ও আপস্তম্বের মতে, বিবাহ ছয় প্রকারের। কিন্তু গৌতম ও বৌধায়ন প্রাজাপাত্য ও পিশাচ এই দুইটি অধিক পদ্ধতি স্বীকার করেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২·৬১ এবং গৌতমস্মৃতি ৪·১-৮ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, প্রকরণ ৫৯ এবং ডাঃ এ. এস. আল্‌টেকর প্রণীত *The Position of Women in Hindu Civilisation* (1938), পৃ° ৪১-৪৮ দ্রষ্টব্য।

ঋক্‌বেদেও এই সকল বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ১০-ম ৩৯ সূক্তে আছে, অশ্বিদ্বয় দেবতা এবং ঘোষা নাম্নী নারীঋষির প্রসঙ্গে ১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে: '* * হে অশ্বিদ্বয়, যেরূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া সম্প্রদান করে, সেইরূপ এই স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করিয়াছি'। মনুর কথা অনুযায়ী ইহা 'অলঙ্কৃত্য সুতাদানং' দৈব-বিবাহেরই উদাহরণ। শ্রদ্ধেয় বি. এস. উপাধ্যায় তাঁহার '*Women in Rigveda*'-গ্রন্থেও (পৃ° ৬৫-৭৫) এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন: আসুরব্রহ্মা-বিবাহ (ঋক্° ১·১০৯·২), প্রজাপত্য (ঋক্° ১০·৮৫ সূ°), গান্ধর্ব (ঋক্° ১০·৩৪·৫, ১·১৩৪·৩), এবং রাক্ষস-বিবাহ (ঋক্° ১০·৯৫·৩)। ইহা ছাড়া Dr. Ludwick Sternback তাঁহার *Institutions in Ancient India* প্রবন্ধে (Vide *The Poona Orientalist, Vol. VI, Nos, 1&2, p 52*) এই সকল বিবাহ কোন্ কোন্ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন: আর্ষ-বিবাহ (যম° ৩১·৫৯, ৩১·৫৯, আপস্তম্ব° *II*, ৫. ১১. ১৮, গোভিল° ৫·৮, সাংখ্যায়ন° ৪·৪,

আশ্বলায়ন° ১'৬'৪, মহাভারত° ১৩'৪৫, আদিপর্ব ১১২, ১৩'৮০)। আসুর-বিবাহ (যম° ১'১৬, আপস্তম্ব° *II*, ৬'১২'১, ৬'১৩'১, গোভিল° ২'১১', সাংখ্যায়ন° ১'১৪'১৬, আশ্বলায়ন° ১'৬'৬, মহাভারত° ১৩৪৪, আদিপর্ব ১১২)। পৈশাচ-বিবাহ (যম° ১'৬১, গোভিল° ৪'১৩, বৌধায়ন° *I*, ১১'২০'৯, সাংখ্যায়ন° ৪'৬, আশ্বলায়ন° ১'৬'৭), এবং রাক্ষস-বিবাহ (যম° ১'৬১, আপস্তম্ব° *II*, ৫'১২'২, গোভিল° ৪'১২, বৌধায়ন° *I*, ১১'২০'৮, সাংখ্যায়ন° ৪'৬, মহাভারত° ১৩'১৪, আদিপর্ব ১১২, আশ্বলায়ন° ১'৬'৮)।

৫৩। স্মৃতি মতে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রজাপত্য বিবাহ তিনটি প্রশস্ত। এই সকল বিবাহে পিতামাতার সম্মতি ও আশীর্বাদ থাকে। যথা : 'স্বয়ং আহূয় দানং কন্যায়াঃ' (ব্রাহ্ম), 'অলঙ্কৃত্য সুতাদানং' (দৈব), 'কন্যাপ্রদানং বিধিবৎ' (আর্ষ) এবং 'কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য' (প্রাজাপত্য)। মনু° ৩'২৭-৩০ দ্রষ্টব্য।

৫৪। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, ইহাকে গান্ধর্ববিবাহ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা 'ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। * * কামসম্ভবঃ' (মনু° ৩'৩৩)। এরূপ বিবাহ স্মৃতিকারদের মতে, ক্ষত্রিয়েরাই করিতেন : 'গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতম্'।

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধরমণী'-তে উল্লেখ করিয়াছেন : বৌদ্ধসাহিত্যেও তিন রকম বিবাহপ্রথার উল্লেখ আছে, যেমন (১) উভয়পক্ষের অনুমতিসূচক বিবাহ, (২) স্বয়ম্বর-বিবাহ, (৩) গান্ধর্ব। অভিভাবকদিগের সম্মতিসূচক বিবাহের উদাহরণ ধর্মপদত্থকথা ১খ° পৃ° ৩৯০, বব্বজাতক সং ১৩৭, নকৃখত্তজাতক সং ৪৯, থেরীগাথাটীকা পৃ° ২৬০, বিমানবত্থুভাষ্য পৃ° ১২৮, মনোরথপূরণী পৃ°২২৭

প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। গান্ধর্ব-বিবাহের উদাহরণ কট্ঠহারিজাতক সং ৭, ধর্মপদত্থকথা ১খ° পৃ° ১৯৯১, ২' খ° পৃ° ২৬০, অশোক-জাতক সং ১০০ এবং তক্কজাতক সং ৬৩ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় (—বৌদ্ধরমণী পৃ° ৬-১৪ দ্রষ্টব্য)।

৫৫। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে স্বয়ম্বরপ্রথার প্রচলন অধিক ছিল। সংস্কৃতকাব্য এবং নাটকাদিতেও বিচিত্র বর্ণনায় ইহা সমুজ্জ্বল। বৌদ্ধসাহিত্যে সয়ম্বর-বিবাহের উল্লেখ আছে। যেমন কুণালজাতকে (সং ৫৩৬) দেখা যায়, রাজকুমারী কন্যার সহিত পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের স্বয়ম্বরপ্রথায় বিবাহ হইয়াছিল। নচ্চ-জাতকেও (সং ৩২) ঠিক এই উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং ধর্মপদত্থকথায় (১ খ° পৃ° ২৭৪-২৭৯) আছে, অসুররাজ বেপচিত্তির কন্যার স্বয়ম্বরপ্রথা অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। (বৌদ্ধরমণী পৃ° ১০-১২)। ইহা ছাড়া অনেকে মনে করেন, ঋক° ১০ ম° ৮৫ সূক্তের ১৩-১৫ শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত সূর্যার বিবাহই পৌরাণিক স্বয়ম্বরের বীজস্বরূপ। যেমন, 'সূর্যায়াঃ বহতুঃ প্র অগাৎ সবিতা যম্ অবহ্জৎ। * * যৎ অশ্বিনা পৃচ্ছমানৌ অয়াতম্ ত্রিচক্রেণ বহতুম্ (=সায়ন : সূর্য্যয়া বহতুং বিবাহমিত্যর্থঃ) * * যৎ অয়াতম্ * পতী ইতি বরেহয়ম্ উপ * * ।'

৫৬। *Eitchburg Sentinel, 18 April, 1898.*

৫৭। প্রকৃতপক্ষে সতীদাহপ্রথা বেদ বা ব্রাহ্মণের যুগে প্রচলিত ছিল না। মহাভারতের সময় যদিও সহমরণপ্রথার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহা বাধ্যতামুলক ছিল না বলিয়াই মনে হয়; কেননা রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পত্নী কুন্তি ও মাদ্রীর মধ্যে মাদ্রী স্বামীর অনুগমন

করেন, যুধিষ্টিরাদি পুত্রগণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজ কুন্তিকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছিল।

স্যার ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar) বলিয়াছেন, সতীদাহপ্রথা একমাত্র টিউটনিক জাতি অর্থাৎ জার্মাণ ও ওলন্দাজ প্রভৃতি এবং অনার্য সাইথিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অভিমতও তাই। তিনি বলিয়াছেন, এই নিষ্ঠুর সহমরণপ্রথা মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ায় এবং এমনকি পূর্ব-ইউরোপে সাইথিয়ানদের ভিতরই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ভারতে ঐ প্রথা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল বলা যায়। তিনি গ্রীক ঐতিহাসিকদের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তক্ষশিলায় (Taxila) ও রাবি নদীর তীরবর্তী দেশগুলিতে ঐ সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং এমন কি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাঞ্জাব প্রদেশেও ঐ প্রথা বহুলভাবে অনুষ্ঠিত হইত। (Vide Vincent A. Smith, C. I. E. : *The Oxford History of India*, *p.* 665)। তবে ঋক্‌সংহিতার ১০ম° ১৮ সূক্তে, অথর্ববেদে (১৮.৩১), আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র (৪.২.১৮) এবং তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতিতে যদিও এই সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোকের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি সেই সব স্থানে মৃত পতীর সহিত জীবিতা পত্নীর সহমরণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন ঋক্‌সংহিতায় ১০ম° ১৮ সূক্তে দেখা যায়,

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।

অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনেয়া যোনিমগ্রে ॥ ৭

এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করুন এবং অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধু

অশ্রুপাত না করিয়া এবং রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্নধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।

উদীর্ঘ নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংভূথ ॥ ৮

হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ সে গতাসু অর্থাৎ মৃত, সুতরাং চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভধান করিয়াছিলেন সেই পতীর পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ণ এই অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা 'মৃতস্য পত্নি' বলিয়া আরম্ভ করিয়া 'দিধিষোঃ গর্ভস্য নিধাতুঃ তবাস্য পত্যু' বলায় মৃত স্বামী পক্ষেই 'দিধিষু' কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বোঝা যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আবার এই 'দিধিষু' কথার উল্লেখ আছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সপক্ষে অর্থ করা হইয়াছে। পুনরায় আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (৪.২.২৮) ঋক্‌সংহিতার অষ্টম শ্লোকের সমর্থন করা হইয়াছে দেখা যায়। যেমন,

তামুত্থাপয়েদ্ দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী।
জরদ্দাসো বোদীর্ঘ নার্যভিজীবলোকমিতি ॥

পণ্ডিত মোক্ষমুলার (Max Mueller) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন: 'Her daughter-in law being a representative of her husband, or an pupil (of her husband), or an aged servant; should cause her to rise (from the place) with (the verse) 'Arise, O wife, to the world of life.' (RK. X. 18. 8).

শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋকবেদসংহিতার বঙ্গানুবাদে ১০ম মণ্ডল ১৮ সূক্ত ৮ম শ্লোকের পাদটীকায় (পৃ° ১৪২৬) বলিয়াছেন ইহা মৃত-ব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য মাত্র, সতীদাহপ্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। ৭ম শ্লোকের পাদটীকায় পুনরায় তিনি বলিয়াছেন: 'ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদসম্মত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গ-দেশের কোন কোন পণ্ডিত এই 'অগ্রো' শব্দটি পরিবর্তন করিয়া 'অগ্নেঃ' রূপান্তরিত করিয়া ঐ ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভূত অর্থ করিয়া-ছিলেন (পৃ° ১৪২৫)। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ৭ম শ্লোকের শেষে 'আরোহন্তু জনেয়ো যোনিমগ্রে' কথাগুলিই আছে, "যোনিমগ্নে" নয়। ভাষ্যকার সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন: ' * জনয়ো ভার্যাঃ তা অগ্রে সর্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহং আরোহন্তু আগচ্ছন্তু।' এখানে 'অগ্নে' কথার কোন উল্লেখ নাই। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *India and Her People* পুস্তকে (পৃ° ২৮০) এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'Some of the Brahmin priests perverted the meaning of the Vedic text.' এবং পণ্ডিত মোক্ষমূলারের সিদ্ধান্তও তদনুরূপ, যেমন 'This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands of lives been sacrificed, and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated, and misapplied *(Vide Selected Essays (1881), Vol. I, p. 338)*.

বি. এস্. উপাধ্যায় তাঁহার '*Women in Rigveda*' (1941)

পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় ম্যাক্‌ডোনেল সাহেবের (Macdonell) অনুমানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল মনে করেন (Vide *Vedic Mythology, p. 165*), ঋক্‌বেদের ১০·১৮৮·৯ এবং অথর্ববেদের কয়েক জায়গায় নাকি সতীদাহপ্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; অর্থাৎ অথর্ববেদের 'ইয়ং নারী লোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্যং প্রেতম্' (১৮·৩·১) এই শ্লোকে নারীর সহমরণের অনেকটা আভাস পাওয়া যায় এবং তাহাই 'ধর্মং পুরাণম্'। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় ডাঃ কেগির (Dr. Kaegi) অনুমানের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ কেগি (Vide Kaegi : *The Rigveda*, p. 171) ঋক্‌সংহিতার ঐ 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে' (১০·১৮·৭) শ্লোকটীকে সতীদাহের অনুকূলে বলিয়া অনুমান করেন। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় অধ্যাপক সরকারের অভিমত দেখাইয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, '* * a few traces of such custom, * * cases of widow burning were rare (and prevented) throughout Vedic period.' (Vide Prof. S. C. Sarkar : *Some Aspects of the Earliest Social History of India*, p. 82)। পণ্ডিত উপাধ্যায় ঋক ১০·১৮·৮ শ্লোকটীকে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বা কেগির মতের খণ্ডন-স্বরূপ বলিয়াছেন (—Vide *Women in Rigveda, p. 97*)।

যদি বলা যায়, সংহিতাকার মনুর যুগে সতীদাহপ্রথা ব্যাপক ও বাধ্যতামূলকভাবে সমাজে দেখা দিয়াছিল, বৈদিক যুগে নয় ; কিন্তু তাহাও ঠিক বলা যায় না। কারণ মনুকে দেখা যায় যে, তিনি ব্রহ্মচারীদের ন্যায় নারীদের জন্য চিতাগ্নি আরোহণের পরিবর্তে পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রতের উপদেশ দিয়াছেন ; যেমন : 'মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী

ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥' মনুর এই পঞ্চম অধ্যায়ের ১৬০ শ্লোক ছাড়াও ১৫৭-১৫৯ শ্লোকগুলির মেধাতিথির ভাষ্য ও কুল্লুকভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য। তবে দক্ষসংহিতায় (৩০'১৯-২০) কিন্তু এই চিতারোহণের বিধি আবার স্পষ্টভাবে দেখা যায়; যেমন, 'মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্। সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ * * সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে।' কাজেই এখানে অনুমান করা অসমীচীন হইবে না যে, সংহিতার যুগে যদিও চিতারোহণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তথাপি তাহা বাধ্যতামূলক ছিল না। আর ইহাও নিছক সত্য যে, সার্বকালিক সমাজে সর্বত্র ঠিক একই আচার, ধর্ম বা প্রথা অখণ্ডভাবে চলিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিভিন্ন তাঁহাদের সমাজ, সমাজের খাতিরে শাসন বা সমাজতন্ত্র, কাজেই একই সময়ে বহুরকম প্রথা, রীতিনীতি ধর্ম বা আচার-বিচারের প্রচলন থাকা মোটেই বিচিত্র নয় এবং সকল সময়ে তাহা ছিল। তবে কথা হইতে পারে প্রাধান্য লইয়া, অর্থাৎ একই সময়ে বহুরকম প্রথা বা নিয়মের প্রচলন থাকিলেও সমাজে তাহাদের মধ্যে প্রধান বা অপ্রধান কোনটি অবশ্যই থাকিত, অখণ্ড একরূপ চিরদিন 'ছিল' বা 'থাকিবে' ইহা কখনই হইতে পারে না।

ডাঃ আল্‌টেকর তাঁহার সুবিখ্যাত *The Position of Women in Hindu Civilisation* (1938) পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃ° ১৩৫—১৬৭) এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সতীদাহপ্রথার উদ্ভব কেন—তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইয়া ডাঃ আলটেকর বলিয়াছেন: "In prehistoric times there prevailed a belief in several societies that the life and needs of the dead in the next

world are more or less similar to those in this existence. It therefore became a pious duty of surviving relations to provide a dead person with all the things that he usually needed when alive." তাহা ছাড়া কেবল প্রাচীন ভারতেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সমাজে সতীদাহপ্রথার প্রচলন ছিল একথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদিও প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তথাপি বিভিন্ন ঘটনা হইতে জানা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয়ান যুগে গল, গথ, নরউইজিয়ান, কেল্ট, স্লাভ, সাইথিয়ান, থ্রেসিয়ান প্রভৃতি জাতিদের ভিতরেও সম্ভবত এই প্রথার প্রচলন ছিল—" * * but the fact that it was practised among the Gauls, the Goths the Norwegians, the Celts. the Slavs the Thracious would justify the inference that it was probably well-established among the Indo-Europeans. It was quite common among the Scythians. In China if a widow killed herself in order to follow her husband to heaven, her corpse was taken out in a great procession."

ডাঃ আল্‌টেকর বলেন, সুপ্রাচীন ঋগ্বেদে ও এমন কি আবেস্তায় সহমরণপ্রথার কোন উল্লেখ নাই। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ স্বীকার করেছেন: "Regarding the practice of Sati, or self-immolation, there is no direct reference to it in Vedic literature. *Grihya Sastras*, * * are silent about it" (Vide *Religion and Society*, p. 179)। বৈদিক যুগে তবে বিধবা

নারীর পুনর্বিবাহ দিবার রীতি ছিল। তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন : "We do not find it mentioned in the Avesta. Nor is it referred to in the funaral hymns of the Rigveda, where it would certainly have been mentioned if it had been in existence. It is true that in the great controversy that raged after the legal prohibition of the Sati custom by Lord William Bentinck, it was argued that a stanza in one of the Vedic funeral hymns gives a canonical sanction to the custom. The case however, could be rendered plausible only by fraudulently changing the last word of the stanza from *agre* into *agneh*" ইহা ছাড়া তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সাহিত্য (১৫০০ খৃষ্টপূর্ব—৭০০ খৃষ্টপূর্ব), গৃহ্যসূত্রগুলি (৬০০—৩০০ খৃষ্টপূর্ব), আরণ্যকাদি ও বৌদ্ধসাহিত্য প্রভৃতিতে সতীদাহপ্রথার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস ও অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য এই প্রথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে মহাভারতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫৮। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী প্রভৃতি সাধ্বী কুললক্ষ্মীদের জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন-বিসর্জনের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে অবশ্য স্বর্ণাক্ষরেই চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। বীর রাজপুত পুরনারীদের সেই আত্মাহুতিরূপ জহরব্রতের পবিত্র স্মারক অনুষ্ঠান আজিও ভারতের কোন কোন স্থানে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তবে ইহা সত্য যে, উহা কখনই সতীদাহ-প্রথার পুনরভিনয় নয়।

৫৯। লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন ১৭৯৮-১৮০৫ খৃ°। ইঁহার শাসনকালের শেষভাগে নির্মম সতীদাহপ্রথা নিবারণের প্রথম চেষ্টা হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আদেশ অনুসারে ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেব ১৮০৫ খৃ° ৫ জানুয়ারী নিজামত আদালতের রেজিষ্টার গুড সাহেবকে এই সম্বন্ধে প্রথম পত্র লিখেন। তদনুসারে ১৮০৫ খৃ° ৪ মার্চ্চ গুড সাহেব সতীদাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান জানিবার জন্য তদানীন্তন নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মাকে পত্র লিখিয়া সমস্ত অবগত হন। ১৮০৫ খৃ° লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ দ্বিতীয়বার গভর্ণর জেনারল্‌ হইয়া ভারতে আসেন। পুনরায় ১৮০৫-১৮০৭ খৃ° জর্জ্জ বার্লো শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উভয়ের সময়েই সতীদাহ-নিবারণের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। পুনরায় ১৮১২ খৃ° এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮১২ খৃ° ৩ আগষ্ট আদালত হইতে গভর্ণর বাহাদুরকে জানান হইলে বিধি-নিষেধাত্মক ৫টী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু বাধ্যতামূলক কিছুই হয় নাই।

১৮১৫-১৮২৩ খৃ° মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের শাসনকাল। ১৮১৫ খৃ° ৪ জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট সার্কুলার অনুযায়ী সতীদাহের একটী তালিকা সংগৃহীত হয় এবং পার্লেমেণ্ট মহাসভায় (House of Commons) ও ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদের সভায় তাহা আলোচিত হয়। তদনুসারে ১৮১৭ খৃ° ৯ সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ঐ প্রথা সর্বতোভাবে নিষেধের জন্য নিজামত আদালত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের একটী আদেশ প্রদান করেন। ১৮২৩ খৃ° পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী একমাত্র বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে দেখা যায়, চারিবর্ণের ৫৭৫ জন বিধবা সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃ° সংখ্যা ৬৩৯ জন এবং

১৮১৫-১৮২৮ খৃ° পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, কাশী ও বেরিলিতে সহমৃতার সংখ্যা মোট হইয়াছিল ৮২১৪ জন। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক স্মিথ (Vincent A. Smith C. I. E.) তাঁহার *Oxford History of India* পুস্তকে (পৃ° ৬৬৫) উল্লেখ করিয়াছেন, নুনিজ (Nuniz) এবং পরিব্রাজক নিকোলো কন্টির (Nicolo Conti) বিবরণ হইতেও জানা যায়, বিজয়নগরের কোন রায় বা রাজার (১৪শ হইতে ১৬শ শতাব্দী) ৫০০ পত্নী এবং আর একজন রাজার ১২০০০ পত্নীর মধ্যে ২০০০ বা ৩০০০ পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

বৃটিশ সরকারের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, একমাত্র বাংলাদেশের (বাংলাদেশের মধ্যে তখন বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অন্তর্ভূক্ত ছিল) বিভিন্ন বিভাগগুলিতে সতীদাহ হইত :

বিভাগগুলির নাম		১৮১৫—১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সতীদাহের সংখ্যা
১। কলিকাতা বিভাগ (বেশীর ভাগ হিন্দু রমণী)	...	৫০৯৯
২। ঢাকা বিভাগ (বেশীর ভাগ মুসলমান রমণী)	...	৬১০
৩। মুর্শিদাবাদ বিভাগ (বেশীর ভাগ মুসলমান রমণী)	...	২৬০
৪। পাটনা বিভাগ (বেশীর ভাগ হিন্দু)	...	৭০৯
৫। বেরিলী বিভাগ „	...	১৯৩
৬। বারানসী বিভাগ „	...	১১৬৫

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৮১৫	৩৭৮	১৮২২	৫৮৩
১৮১৬	৪৪২	১৮২৩	৫৭৫
১৮১৭	৭০৭	১৮২৪	৫৭২
১৮১৮	৮৩৯	১৮২৫	৬৩৯
১৮১৯	৬৫০	১৮২৬	৫১৮
১৮২০	৫৯৮	১৮২৭	৫১৭
১৮২১	৬৫৪	১৮২৮	৪৬৮

সমগ্র ভারতবর্ষে তখন সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হইলেও বাঙ্গালায় রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৮ খৃ° তাঁহার 'প্রবর্তক ও নিবর্তক', ১৮১৯ খৃ° ও ১৮২০ খৃ° আরও দুইখানি সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তক, ১৮২১ খৃ° 'সংবাদকৌমুদী' এবং ১৮২২ খৃ° তাঁহার 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রিকাদ্বয়েও সতীদাহের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ চলিতে থাকে। ইহার পূর্বে ১৮১৭ খৃ° হিন্দুদের কয়েকজন আবার নিজামত আদালতের নিষেধবিধির বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল্ হেষ্টিংসের নিকট আবেদন করেন। ১৮১৮ খৃ° রাজা রামমোহনের উদ্যোগে ঐ আবেদনের বিরুদ্ধে আর একটী আবেদন প্রেরিত হয়। ১৮২০ খৃ°—১৮২৮ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকাল। এই সময়ের মধ্যে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৮২৬ খৃ° ১২ আগষ্ট হ্যামিল্টন সাহেব উক্ত আইন ধারা সাধারণে ঘোষণা করেন। ১৮২৮ খৃ° ১২ মার্চ লর্ড আমহার্ষ্ট শাসনকর্তার পদ পরিত্যাগ করিলে ঐ সালের ১৩ মার্চ হইতে ৩ জুলাই পর্যন্ত বেলি সাহেব (W. B. Bayley) গভর্ণর জেনারল্ হন। ১৮২৮ খৃ° ৪

জুলাই—১৮৩৫ খৃ° ২০ মার্চ পর্যন্ত লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল। এই সময়ে পুনরায় রাজা রামমোহন-প্রমুখ হিন্দুদের একান্ত প্রচেষ্টায় লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃ° ৪ ডিসেম্বর রেগুলেশন XVII অনুযায়ী অমানুষিক সতীদাহপ্রথা একেবারে ভারত হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন এবং ১৮৩০ খৃ° ১৬ জানুয়ারী রাজা রামমোহন প্রভৃতি দেশনেতৃগণ গভর্ণরকে কলিকাতা টাউন্হলে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন (বিস্তৃত বিবরণ J. Paggs : *India's Cries to British Humanity p.* 665 দ্রষ্টব্য)।

৬০। Sir M. M. Williams : *Brahminism and Hinduism, p.* 482.

৬১। নারীজাতির অবরোধপ্রথার ইঙ্গিত বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখা যায়। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন: ধর্মপদত্থকথায় (২ খ° পৃ° ২১৭) আছে যে, 'বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলে অবস্থাপন্ন পিতামাতা কন্যাকে সাততলা প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন।' তবে এই রীতির ব্যতিক্রম আবার ঐ বৌদ্ধসাহিত্যেই দেখা যায়; যেমন 'বিবাহের পর বিসাখা যখন শ্বশুরালয়ে আগমন করেন তখন অনাবৃত রথে চড়িয়া তিনি শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।' ধর্মপদত্থকথায় (১ খ° পৃ° ১৯০-১৯১, ৩৩৮) আবার উল্লেখ আছে, সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরা সচরাচর কোথাও যাতায়াত করিতেন না; তবে উৎসবের সময় তাঁহারাও আবার সহচারিণীদের সহিত পদব্রজে নদীতে স্নান করিতে যাইতেন (বৌদ্ধরমণী পৃ° ১৫ দ্রষ্টব্য)।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার *The Web of Indian Life* পুস্তকে (পৃ° ৭৭-৭৯) এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "The

custom in its present rigour dates undoubtedly from the period of Moslem rule. Where that rule was firm and long established, it has sunk deep into Hindu habit."—অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের শাসন যেখানে প্রবল ছিল সেখানেই হিন্দুদিগের ভিতর অধিকতরভাবে এই পর্দাপ্রথা প্রবেশ করিয়াছিল। অন্যান্য স্থানে তত প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ভগিণী নিবেদিতা উল্লেখ করিয়াছেন : "But although it dates from the era of Ghazni or Ghor—except where the Rajput made an independent introduction of the *Purdah*—there is nothing to show that the cloistering of women was spread in Hindostan by other means than by the force of fashion and imperial prestige". তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, ইস্‌লামধর্মীরা আরবীয় সমাজ হইতে ঐ পর্দাপ্রথা ধর্মের একটি অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার কাহারো কাহারো মতে, মুসলমানেরা নিজেরাই ঐ প্রথা পারস্য, চীন বা গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগিণী নিবেদিতা বলেছেন : 'Thus it becomes characteristic of conquering races, and among Hindus is imitated with marked energy by Bengal."—তদানীন্তন শাসকজাতি মুসলমানদের নিকট হইতে রাজপুতদের পর বাঙ্গালাই বেশীর ভাগ ঐ অবরোধপ্রথা অনুকরণ করিয়াছিল। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, কেবল মাত্র শাসকজাতিদের ভয়ে ঐ-প্রথা নূতনভাবে হিন্দুদের ভিতর প্রবর্তিত হয় নাই, পূর্বেও তাহা প্রচলিত ছিল, কারণ তাহা না হইলে বৌদ্ধসাহিত্যেও উহার কখনই উল্লেখ পাওয়া যাইত না।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অভিমতও তাই। তিনিও 'than it used to be in ancient times' বলিয়া নারীজাতির অবরোধ-প্রথা যে সামান্যভাবে বা অন্য আকারে হিন্দুসমাজে মোগল রাজত্বের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এইকথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন: যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে নারীদের অবরোধপ্রথার উল্লেখ কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায় (*'alludes occasionally'*), তথাপি বর্তমানে ব্যাপকভাবে যে ঐ প্রথা ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণই—প্রবল পরাক্রান্ত মোগল শাসকদের অত্যাচারের আশঙ্কা ('The example of the dominant Muslims,'); বিদেশীয়দের হাত হইতে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবার জন্য ('to give the female members * * every possible protection against the foreigners')। হিন্দুরা নিজেরাই আবার ঐ প্রথা অধিকভাবে সমাজে প্রবর্তন করিয়াছিলেন—'* * made the practice of living 'behind the curtain.' (Vide V. A. smith: *The Oxford History of India, p. 261*)। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ মুসলমান যুগেই সমগ্র বাঙ্গালায় ও ভারতের স্থানে স্থানে পর্দা বা অবরোধপ্রথা প্রকৃত সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। আর. পি. মাসানি (R. P. Masani) উল্লেখ করিয়াছেন: 'There was no 'purdah', not seclusion; the burning of widows on their husband's funeral pyre was unknown' (Vide *The Legacy of India, pp. 145-146*)। সুতরাং এ-কথা নিশ্চিত যে, ঋগ্‌বৈদিক যুগে পর্দা বা অবরোধপ্রথার প্রচলন ছিল না।

৬২। Sir M. M. Williams: *Brahminism and Hinduism.*

৬৩। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'মাদারহুড্ অফ্ গড্' (*Motherhood of God, p. 10*) পুস্তকে এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'হিন্দুনারীদের অবস্থা সম্বন্ধে বহুরকম গল্পই পাশ্চাত্যদেশবাসীর নিকট হইতে সকলে শুনিয়া থাকিবেন। এইগুলির বেশীর ভাগ অতিরঞ্জিত, কতকগুলি নিছক মিথ্যা এবং কতকগুলি হয়তো অর্ধসত্য হইতে পারে'।

Lectures at Jamshedpur (pp. 7-8) পুস্তকেও স্বামী অভেদানন্দ এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন : 'বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, সমুদ্র বা গঙ্গার মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত আমি পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু একটী মাত্র কুম্ভীরও কখন কোথায় দেখি নাই! আর যদিই ইহা সত্য হয় যে, হিন্দুজননীরা তাঁহাদের শিশু-সন্তানগণকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভীরদিগকে খাইতে দিতেন তবে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহা হইলে আমার ন্যায় একজন হিন্দু-সন্তানের পক্ষে কিরূপে এই সুদূর আমেরিকায় আসা সম্ভব হইল? আমিও তো সেই হিন্দু সন্তানগণের মধ্যে একজন? কাজেই একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় না কি. এই সকল আজগুবি কাহিনী খৃষ্টান প্রচারকদের নিজস্ব এবং উর্বর মস্তিষ্কেরই সৃষ্টিবিশেষ?'

৬৪। স্বামী অভেদানন্দের 'জামসেদপুর বক্তৃতা' (*Lectures at Jamshedpur*), পৃ° ৮

৬৫। Sir M. M. Williams: *Brahminism and Hinduism, p. 118.*

৬৬। P. Ramabai: *High-caste Hindu Women, p. 26.*

৬৭। এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হইবে না যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'হিন্দুধর্মে নারী' সম্বন্ধে বক্তৃতাটী প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্বে আমেরিকায় নিউইয়র্কে প্রদান করিয়াছিলেন। তখনকার হিন্দু-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন বর্তমানের মত এত ব্যাপক ছিল না। বর্তমান ভারতে ইহার বিস্তৃতি ও উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে। ভারতের সর্বত্র এখন নারীদের জন্য সকল রকম বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, অশিক্ষার অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সার্বজাতিক ভারতীয় নারীরাই এখন সকল রকম ভাষা ও জ্ঞাতব্য বিষয় দক্ষতার সহিত অনুশীলন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছেন। সাহিত্য, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চারুশিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনীষার পরিচয় দিয়া সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিকে তাঁহারা আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। ভারতের বাহিরেও হিন্দুনারীর প্রশংসায় আজ চতুর্দিক মুখরিত। ইংলাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বোচ্চ উপাধি (Doctorate degree) লাভ করিয়া ভারতের জাতীয় গৌরবকে তাঁহারা সত্যই মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা ও বিশ্ববারা প্রভৃতির অপূর্ব উদাহরণকে আবার তাঁহারা প্রাণবান করিতে সমর্থা হইয়াছেন। সমাজ-সংস্কারে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও অধিকারে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, বিচার-বিভাগে, শিক্ষাকেন্দ্র, চিকিৎসায় ও দেশের সর্ববিধ সংগঠনে আজ নারীর অগ্রগামিতা ও অবদানকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস অবশ্যই স্মরণ রাখিবে; বর্তমান ভারতবাসীও সেইজন্য

নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ চিরদিনই ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী এবং অনুক্ষণই ছিল নারীজাতির উন্নতি ও কল্যাণ-কামনার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। ৩৭ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন স্ত্রীশিক্ষার সামান্য কৃতকার্যতা দেখিয়াই তিনি যে গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, আজিকার এই পরিপূর্ণতা ও গৌরব-সমুজ্জ্বল দিনের চিত্র বর্ণনা করিলে অবশ্যই তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতার প্রতিছন্দে ভারতীয় নারীর প্রশংসা আরও সহস্রগুণে মুখরিত হইয়া উঠিত!

৬৮। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে বিশেষ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন যে যথেষ্টই ছিল তাহার প্রমাণ সেই সেই সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, শিল্প, ভাস্কর্য, কলাবিদ্যা, এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়েও পুরুষদের ন্যায় নারীজাতির অধিকার সমান ছিল। এমন কি কামশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যুৎপত্তি লাভেও নারীরা অকুণ্ঠিতা ছিলেন না। মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাঁহার কামশাস্ত্রে (৩ অ° ২ সূ°) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন: 'প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী',—পিতৃগৃহে থাকিয়াই এমন কি নারীরা কামসূত্র ও 'তদঙ্গবিদ্যা' অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। টীকাকার যশোধরেন্দ্র তাহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন: 'প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতুর্গৃহ এব তরুণ্যাঃ পরিণীতত্বাদস্বতন্ত্রায়াঃ কুতোঽধ্যয়নম্?' ইত্যাদি। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন: 'প্রত্তা চ পত্যুরভিপ্রায়াৎ।'—(১·৩·৪) প্রত্তা অর্থাৎ বিবাহিতা নারীরাও স্বামীর অনুমতি লইয়া 'তদঙ্গবিদ্যাশ্চ গীতাদিকাঃ' শিক্ষা করিতে পারেন।

পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য, নাটক ও কাব্য গ্রন্থগুলিতেও নারীশিক্ষার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অন্যান্য কলাবিদ্যাতেও

প্রাচীনকালে নারীদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে (৮৬৭) দেখা যায়, কবি অযোধ্যার রাজ্ঞী ইন্দুমতীকে ললিতকলাবিদ্যায় তাঁহার স্বামী মহারাজ অজের প্রিয়শিষ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন, 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।' বিক্রমোর্বশী-নাটকে (৪র্থ অঙ্কে) আছে, চিত্রলেখা সহজন্যার সহিত অভিনয়মঞ্চে প্রবেশ করিয়া দ্বিপদিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতি গীতি, ককুভরাগ ও খুরক নামক নৃত্য করিয়াছিলেন। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীতরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সমস্ত গীতি, রাগ ও নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় (প্রস্তাবনা) উল্লেখ আছে, সূত্রধরের উত্তরে নটী 'অধ কদমং উণ উদুং অধিকরি অ গাইস্সম্'—তবে কোন ঋতু অবলম্বন করিয়া আমি সঙ্গীত করিব জিজ্ঞাসা করিয়া পরে সূত্রধরের ইঙ্গিতে 'ইসীসিচুম্বিআইং * * *' ইত্যাদি গান করিয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-নাটকে (৩ অঙ্ক) দেখা যায়, বকুলা মালবিকাগ্নিকাকে নৃত্যের কথা বলিতেছেন। তাহা ছাড়া ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রেও পুরুষ ও নারীদের উপযোগী তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে নৃত্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে দেখা যায়। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাই। মহাদেব সৃষ্টির প্রভাতে অঘোরাদি পঞ্চমুখ দিয়া ভৈরবাদি পঞ্চরাগ সৃষ্টি করিলে পার্বতীও নটনারায়ণ নামে একটী অপূর্ব রাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

নারীদের নৃত্যগীত অনুশীলন বিষয়ে নট গাঙ্গো (গাঙ্গোক) রচিত কয়েকটী শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতেও দেখা যায়। প্রাচীনকালে নৃত্য-গীত চর্চা বা নটবৃত্তি যাহারা করিতেন সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয়া ছিলেন না। জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী যে নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী ছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। সেকশুভোদয়ায় দেখা যায়, লক্ষ্মণসেনদেবের সভায় গাঙ্গো নটের

পুত্রবধু বিদ্যুৎপ্রভা সুমধুর সঙ্গীত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত রাগ-রাগিণীর পরিচয় তদানীন্তন সমাজে নারীরা ভালভাবে জানিতেন। রূপরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে 'তাণ্ডব' ও 'নটীনৃত্য'-এর পরিচয় দিয়াছেন। অনেকের মতে তাহা অভিজাতবংশীয় নারীদের ভিতর নাকি প্রচলিত ছিল না। রূপরাম রাজদরবারে গৌড়নিবাসিনী সনকা নটীর নৃত্য-গীতের উল্লেখ করিয়াছেন (দীনেশচন্দ্র সেন : বাংলার ইতিহাস)। এ'ছাড়া ডাঃ আল্‌টেকর প্রণীত *The Position of Women in 'Hindu Civilisation* (1938) পৃঃ ২১৩—২১৭ এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত "রাগ ও রূপ" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ইহা ছাড়া নারীদের কলাবিদ্যা ও শিল্পে যে সম্পূর্ণ অধিকার ও পারদর্শিতা ছিল তাহা বৈদিক সাহিত্যেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন : বেদ এবং সংহিতায় নারীদের শিল্পচাতুর্যের কথা আছে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে 'রজয়িত্রী'—ছাঁচ নির্মাণকারিণী, 'পেশস্কারী'—সূচীকর্মকুশলা, 'কণ্টকীকারী'—কণ্টক নির্মানকারিণী এবং 'বিদলকারী'—গৃহস্থালী ব্যবহার্য বস্তু নির্মাণকারিণী প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে (Vide R. K. Mookerji : *Hindu Civilization, p. 97*)। সংস্কৃতির স্বর্ণময় যুগ বৌদ্ধযুগের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বৌদ্ধ-রমণী' পুস্তকে (পৃ° ৮২-৮৮) উল্লেখ করিয়াছেন : 'বৌদ্ধযুগের অনেক রমণী শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ-ভ্রাতাদেরই সমকক্ষ ছিলেন।' বৌদ্ধ-সাহিত্যে উল্লেখ আছে : থেরীগাথার অপূর্ব শ্লোকগুলি বিদুষী বৌদ্ধ নারীদের দ্বারা রচিত। 'সুক্কা নাম্নী একজন ভিক্ষুনী রাজগৃহের এক বৃহৎ জনতার সম্মুখে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন' (সংযুক্তনিকায়,

১ খ°, পৃ° ২১২-২১৩)। 'ক্ষেমা বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।' * * 'ভদ্দা কুণ্ডলকেশা সংসার ত্যাগ করিয়া নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। * * তর্কে সারিপুত্ত অন্য কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না' (থেরীগাথাভাষ্য, পৃঃ ৯৯)। * * 'ধম্মদিন্না বৌদ্ধদর্শনে সুপণ্ডিতা ছিলেন (মঝ্ঝিম-নিকায়, ১ খ°)। তিনি বিনয়গ্রন্থও বিনয়গ্রন্থও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন' (দীপবংস ১৮ পর্ব)। * * শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা লতা বিশেষ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন (বিমানবত্থ ভাষ্য, পৃ° ১৩১)। 'সঙ্ঘমিত্তা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। যাদুবিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল' (দীপবৎস, ১৫ পর্ব)। * * 'অঞ্জলি ছয়টী অলৌকিক গুণ এবং মহান্ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। বিনয়পিটকেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। * * তিনি অনুরাধাপুরে ১৬ হাজার ভিক্ষুনীসহ গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয়পিটক হইতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।' * * 'উত্তরা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।' * * 'সীবলা এবং মহারুহা অনুরাধাপুরে বিনয়-পিটক, সুত্ত-পিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধমের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন।' * * 'হেমা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন' (দীপবংস ১৫ প°)।' * * 'অগ্গমিত্তা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। * * 'চুলনাগা, ধন্না, সোণা, মহাতিস্সা, চুলসুমনা এবং মহাসুমনা প্রভৃতি নারীগণ শিক্ষিতা * এবং শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন।' * 'নন্দুত্তরা বিদ্যা ও শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন (থেরীগাথাভাস্য, পৃ° ৮৭)।' * * ইহা ছাড়া বৌদ্ধসাহিত্যে উপ্পলবন্না, সোভিতা, ইসিদাসিকা, বিসাখা, সবলা, সঙ্ঘদাসী, নন্দা, থেরী উত্তরা, মল্লা, পবতা, ফেগ্গু ধমদাসী,

অগ্‌গিমিত্তা, পদাদপালা, সোমা, গিরিদ্ধি, দাসী, ধম্মা, সুমনা, মহাদেবী, পদুমা প্রভৃতি বিদুষী রমণীগণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (বিস্তৃত বিবরণ 'বৌদ্ধরমণী' দ্রষ্টব্য)।

৬৯। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *Doctrine of Karma* পুস্তকে (পৃ° ৮৬) উল্লেখ করিয়াছেন: 'We can safely say that there is such a thing as absolute freedom, which will be attained sooner or later as the ultimate purpose of every human life.'—ইহা অতীব সত্য যে, পরমপুরুষার্থ বলিয়া সংসারে এক দিব্যবস্তু আছে; শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, মানুষ একদিন সেই মুক্তিরূপ চরমলক্ষ্যে উপনীত হইবে।

প্রকৃতপক্ষে মুক্তির অধিকারী সকলেই, ইহার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বলিয়া কোন-কিছু নাই। উপনিষদে বলা হইয়াছে: 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীমাদত্তে তেন স রক্ষ্যতে॥' (শ্বেতাশ্বতর ৫'১০); অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই পারমার্থিকী দৃষ্টিতে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, কর্ম্মানুসারে যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেই সেই শরীরানুসারে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪'৩) দেখা যায়: 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।'—আত্মা স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী ও বৃদ্ধ সবই। জীব আত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া অন্য কিছু নয়, 'কালেনাত্মনি বিন্দতি' —যথাসময়ে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে নিজের স্বরূপকে সে চিনিতে পারিবে এবং এই প্রত্যভিজ্ঞা বা জ্ঞানলাভ হিন্দুধর্ম কেন, সকল ধর্ম্মেরই চরমলক্ষ্য।

গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশাস্ত্র নারীকে পুরুষের ন্যায়

সমান অধিকার দান করিয়াছে। গীতায় আছে : 'মাং হি পা ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥' (৯'৩২)—'হে পার্থ, যাহারা অসৎকুলজাত, সেই সকল স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করিয়া থাকে।' এখানে 'পাপযোনয়ঃ' (অন্ত্যজাদয়ঃ) বলিয়া পরবর্তী ৩৩ শ্লোকে 'পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ' অর্থাৎ 'পুণ্যযোনয়ঃ' বলায় বেশ একটু বিচারবৈষম্য দেখানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতিকে নিম্নস্তরে ফেলিয়া ব্রাহ্মণ, রাজা, ঋষি প্রভৃতিকে পুণ্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই বৈষম্য ঠিক নয়, কারণ 'তথা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাঃ' বলিতে শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন ও আচার্য শংকর প্রভৃতি সকলে 'অধ্যয়নরহিতাঃ', 'বেদপাঠরহিতাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। পুনরায় 'চেৎ সুদুরাচারো' বলিয়া ৩১ শ্লোকে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি' প্রভৃতি কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সামাজিক বৈষম্যের খাতিরে অধিকারী নির্দেশ করাই গীতার উদ্দেশ্য, নচেৎ 'সর্বভূতস্থিতং' যো মাং' (৬'৩১) 'জীবনং সর্বভূতেষু' ((৭'৯), 'বীজং মাং সর্বভূতানাং' (৭'১০), 'নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা' (১০'৩৪), 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ * * সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি' (১৩'১৩) 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব * * বিদ্ধি' (১৩'১৯), 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে' (১৮'৬১) প্রভৃতি কথা কখনই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উল্লেখ করিতেন না, কেননা তিনি নিজেই আবার বলিয়াছেন : 'সমোঽহং সর্বভূতেষু' (৯.২৯)—কি পুরুষে, কি নারীতে, এবং এমন কি সমস্ত জীবজগতে ঈশ্বর (আমি) সমান প্রকাশ-শীল—'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ'। কাহারো উপর আমার হিংসা বা বেশী ভালবাসা নাই—'ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। সুতরাং

খৃষ্টান মিশনারীদের মতে, যদি নারীদের আত্মা বলিয়া কিছু না থাকে, তবে তাহা কাঠ, পাথরের ন্যায় বস্তুও হইতে পারে না, কারণ 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' (কঠ° ৩·২), মুখ্যপ্রাণ-রূপী আত্মা হইতে বিশ্বচরাচর উদ্ভূত বা সৃষ্ট হইয়াছে ; 'গুহহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' (কঠ°২·১২)—নিখিল চরাচরের অন্তরে একমাত্র চৈতন্যময় আত্মাই বিরাজিত। এই আত্মাই চণ্ডীতে 'ত্বং স্ত্রী ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ * * পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী' (১·৭৯, ৮২)। আত্মাই 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' (১১·৬)—সমগ্র জগতের আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী। সুতরাং বিশ্বের নারীজাতি জগৎকারণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নন, কিন্তু 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা' (১১·৪)—জগজ্জননী পরমেশ্বরী, সর্ব জগতস্বরূপিণী। হিন্দুর চক্ষে জড় ও চৈতন্য—spirit এবং matter ভিন্ন নয়, একেরই দুই রূপ, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'টাকার এপীঠ আর ওপীঠ।' প্রাণময় ও চৈতন্যময় যখন বিশ্বচরাচর, তখন 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে,'—অখণ্ডের অংশ কল্পনা করিলেও হিন্দুর অনুভূতিপূর্ণ চক্ষে তাহা এক ও অখণ্ড, সুতরাং চিরপবিত্রা নারীজাতি কেবল প্রাণহীনা, অনাত্মা এবং মুক্তির অনধিকারিণী একথা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। হিন্দুধর্ম তাই চিরদিন নারীজাতিকে শ্রদ্ধা ও পূজার আসন দিয়া আসিয়াছে এবং ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ।

৭০। মহাপ্রজাপতি গোতমী বুদ্ধের ধাত্রীমাতা। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য কপিলাবস্তুর নিগ্রোধ-আরামে বুদ্ধদেবের নিকট উপনীত হইলে ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। পরিশেষে প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধদেব সম্মত হন, কিন্তু আনন্দকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন : 'হে আনন্দ, মহাপ্রজাপতি গোতমী যদি প্রধান আটটী অনুশাসন পালনের

প্রতিশ্রুতি দান করেন তবে তিনি দীক্ষিতা হইয়াছেন মনে করা যাইতে পারে।' ইহার পর মহাপ্রজাপতি গোতমী প্রধান আটটী অনুশাসন পালনে প্রতিশ্রুতা হইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হন এবং তাঁহার সহিত আরও পাঁচশত শাক্য রমণী বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের সম্মুখে গমন করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান তথাগত তাঁহাকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহাপ্রজাপতি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্য পাঁচ শত ভিক্ষুণী নন্দকের উপদেশ শ্রবণ করার পর ছয়টি শাখার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন' (ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহাঃ 'বৌদ্ধরমণী', পৃ° ১০১-১০৫ দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায় যে, শাক্যবংশীয় আরও অনেক রমণী যেমন, তিস্‌সা, ধীরা, মিত্তা ভদ্দা, উপসমা প্রভৃতি মহাপ্রজাপতির সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন।

অনেকের অভিমত যে, বৌদ্ধসংঘে নারীর প্রবেশলাভ বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতির একটী প্রধানতম কারণ। পরবর্তী কালে ইহার জন্যই নাকি বৌদ্ধধর্মে ও সংঘে নানারূপ দৈন্য ও গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল (ভিক্ষুণীপ্রতিমোক্ষ দ্রষ্টব্য)। এমন কি মহাপ্রজাপতি গোতমীকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিবার পর ভগবান বুদ্ধ নিজেই আনন্দকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেনঃ 'হে আনন্দ, যেহেতু রমণীরা সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি লাভ করিয়া সংঘে প্রবেশ লাভ করিল, সেইহেতু এই পবিত্র ধর্ম হাজার বৎসরের পরিবর্তে পাঁচ শত বৎসর মাত্র স্থায়ী লাভ করিবে' (বিনয়-পিটক, ৩ খ° পৃ° ৩২৫-৩২৬ দ্রষ্টব্য)।

ভগবান তথাগতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলেও অনেকে বলেন, বৌদ্ধ-

সংঘে নারীরা প্রবেশ করার জন্য ধর্ম ও সংঘের অসাধারণ প্রসারতা লাভ হইয়াছিল। ডাঃ শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত উল্লেখ করিয়াছেন : 'The part played by woman in the spread of Buddhism cannot be ignored or brushed aside as of little importance' (Vide Dr. N. K. Dutt : *The Spread of Budhism, pp. 72-77*) ; অর্থাৎ নারীরা সংঘে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্মের যতটুকু কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলে চলিবে না। তিনি বলিয়াছেন, বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, একমাত্র নারীদের প্রভাবেই তদানীন্তন সমগ্র পরিবার একেবারে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। বিশাখা ও অম্বাপালীই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। অনাথপিণ্ডকের কন্যার প্রভাবে সমগ্র অঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উদেন পত্নী রাণী সমাবতীর দৃষ্টান্তও তাই। এজন্য ডাঃ দত্ত স্বীকার করিয়াছেন : 'The Bhikkunis thus carried the light of the new religion from house to house and helped the spread of Buddhism far and wide' (*Ibid., p. 77*)। নারীদের জন্যই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতে এবং সুদূর ভারতেতর প্রদেশে অতি শীঘ্র এত ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত কার্ণের অভিমতও তাই (Vide Kern : *Mannual of Indian Buddhsim, pp. 37-38*)। ইহা ছাড়া ডাঃ দত্ত উল্লেখ করিয়াছেন : 'Not only did it afford relief to many a woman * * but it also recognised the dignified position in which the women had claim to be placed along with the men through the implication that they were as much eligible to the making of efforts

for spiritual emancipation as the males' (*Ibid. p. 77*)। ইহা সত্য যে, বৌদ্ধসংঘে নারীরা প্রবেশ লাভ করায় নূতন করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে আবার পুরুষের সহিত সর্ববিষয়ে নারীদের সমান অধিকারের ভাব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, নারীদের প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার শুধু বৌদ্ধযুগে নয়, সকল সময়েই যে ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি নারীরা ঋগ্বেদের বিশেষ বিশেষ নারী-ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বলিয়া অভিহিতা। তাঁহাদের সম্বন্ধে 'ব্রহ্মবাদিনী' কথার উল্লেখও বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে পাওয়া যায়; যেমন: 'ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতা', এবং সায়নের অথর্বভাষ্যে (১১.৩.২৬) আছে—'ব্রহ্ম বেদঃ, * * ইতি ব্রহ্মবাদিনঃ, ব্রহ্মবিচারকা মহর্ষয়ঃ'। অথর্ব ১১.৩.২৬ এবং ১৫.১.৮, তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭.৪.১০.১-২ ও বৃহদারণ্য-কোপনিষদ্ ৩.৬.১, ৮.১.১২ প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন: ধর্মশাস্ত্রে বা গৃহ্যসূত্রে 'ব্রহ্মবাদিনী' ও 'ব্রহ্মচারিণী' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। যেমন, হারীত (২১.২৩) বলিয়াছেন: 'স্ত্রীজাতি দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধু। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, অগ্নীন্ধন (অগ্নিতে সমিদাধ্যান), বেদধ্যায়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা' বর্তমান ছিল (—শাস্ত্রী: ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ, পৃ° ৪৮)। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন: 'ধর্মশাস্ত্রকার যম স্ত্রীলোকদের উপনয়নাদি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন: 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা॥' 'স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে, পরিণীতা না হইয়া এবং সংসারশ্রমে না যাইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্যাব্রত গ্রহণ ও ভিক্ষুজীবন যাপন করিতেন,

রামায়ন ও মহাভারত হইতে বহুলভাবে প্রমাণ করিতে পারা যায়। রামায়নের অরণ্যকাণ্ডে শ্রীমতী শবরীর উল্লেখ আছে। ইনি 'চীরকৃষ্ণা-জিনাম্বরা', 'জটিলা' (৭৪.৩), 'সিদ্ধা', 'সিদ্ধসম্মতা' 'বৃদ্ধা' ও 'তাপসী' (৭৪.১০) ছিলেন। * * * মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অষ্টাবক্র-বৃদ্ধা-সংবাদে জানা যায়, বৃদ্ধা অষ্টাবক্রকে বলিতেছেন: 'কৌমারং ব্রহ্মচর্যং মে কন্যৈবাস্মি ন সংশয়ঃ। পত্নীং কুরুস্ব মাং বিপ্র শ্রদ্ধাং বিজহি মা মম॥' মহাভারতে, শল্যপর্বেও (৫৫.৬-৭) দেখা যায়, মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা কৌমারী ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। ঐ শল্যপর্বেই (৫৩.৭,৯) আছে, মহর্ষি গ্যার্গের কন্যা ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। শান্তিপর্ব ৩২৫ অধ্যায়ে ভিক্ষুকী স্থলভার নাম পাওয়া যায় এবং আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ৩.৪.৪ দ্রষ্টব্য (শাস্ত্রী: ভিক্ষু-ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ, পৃ° ৫১-৫২)। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন: 'ভিক্ষুণী অর্থাৎ শাক্য ভিক্ষুণীর সৃষ্টির পূর্বে যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আরো সন্ন্যাসিনী ছিল, * * ইহা স্পষ্টই জানা যাইবে। ত্রিপিটকেরই অন্যান্য লিখায় ইহা আরো সমর্থিত হয়।' তিনি আবার উল্লেখ করিয়াছেন: জৈন-সন্ন্যাসিনীরা অজ্জা অর্থাৎ আর্যা বা আর্যিকা নামে প্রসিদ্ধা। আবার ভিক্ষুণী নামেও ইঁহারা প্রসিদ্ধা ছিলেন (আচারাঙ্গসূত্র, ২.১.১.১ ইত্যাদি)। জিনসেন কৃত মহাপুরাণে পাওয়া যায়, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় ব্রাহ্মী ও সুন্দরী নাম্নী দুই ভগিনী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। * * রাজা চেতকের কন্যা মহাবীরের শিষ্যা ও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। ইনি আবার ৩৬০০০ সহস্র আর্যা বা ভিক্ষুণীর অধ্যক্ষা (গনিণী) ছিলেন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের ৩২০,০০০ জন ভিক্ষুণী শিষ্যা ছিল। গুণভদ্র কৃত উত্তরপুরাণে অন্যান্য তীর্থঙ্করদেরও এইরূপ অসংখ্য ভিক্ষুণীর উল্লেখ আছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এই সমস্ত হিন্দু-সন্ন্যাসিনীদের কথা অবগত ছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন: "A point of interest is that 'women are permitted to share in the philosophic life' with the ascetics on condition that they 'observe sexual continence like the men' [Megasthens Fragment 40]. This is olso observed by Nearchus and Strabo [*XV*, *C. 718*]" —(Vide Mookerji : *Hindu Civilization, p. 312*)।

৭১। ইহার যুক্তিপূর্ণ কারণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *Motherhood of God* পুস্তকে (পৃ° ৪-৫) উল্লেখ করিয়াছেন: 'যত বেশী আমরা উপলব্ধি করিব যে, ঈশ্বর কেবল বিশ্বোত্তীর্ণ (transcendent) নন, তিনি বিশ্বভূত (immanent) এবং চরাচরাত্মক এই প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত, ততই আমরা বুঝিব যে, ঈশ্বর যেমন জগৎপিতা তেমনি জগন্মাতাও বটে। যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, পুরুষ বা স্রষ্টা ইহতে প্রকৃতি বা সৃষ্টি সম্পূর্ণ অভিন্ন—প্রকৃতি জড়া ও শক্তিহীনা নন, কিন্তু আদ্যাশক্তিরূপিণী তখনি বুঝি যে, ঈশ্বর পরিপূর্ণ, এক ও অদ্বিতীয়; তিনি পুরুষ এবং স্ত্রী দুই। এই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যই অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিরূপে আমাদের জগজ্জননী।'

৭২। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর উ° ৪·৩

৭৩। গীতার যিনি 'মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম' (১৪·৩), তিনিই বিশ্বচরাচরের গর্ভস্বরূপা প্রকৃতি। চণ্ডীতে ইঁহাকেই রাজা সুরত 'কা হি সা দেবী

মহামায়া' (১'৬০) বলিয়া জানিতে চাহিয়াছেন। মেধস ঋষি তাঁহারই পরিচয়ে বলিয়াছেন: 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্' (১'৬৪)। ইনিই বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী ও ভগবতী (১'৭০-৭১), ইনিই স্বাহা, স্বধা ও বষট্কারা (১'৭৩) এবং ইনিই মহাবিদ্যা, মহামায়া (১'৭৭) ও প্রকৃতি (১.৭৮)। ইঁহাকেই চণ্ডীতে পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে: 'সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা' (৪'৭)।

এই প্রকৃতিই অদ্বৈত বেদান্তের অব্যক্ত, প্রজ্ঞা ও বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ঈশ্বর। তন্ত্রের ইনিই মহামায়া, ইঁহাকেই আবার অনির্বাচনীয়া বলা হইয়াছে। ঈশ্বর, অব্যক্ত বা মহামায়া যখন সূক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হন তখনি তিনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—প্রজাসৃষ্টির অধিপতি; এইজন্য হিন্দুরা নিত্যা মহামায়াকে ব্রহ্মারও জননীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। চণ্ডীতে ইঁহাকে তাই বলা হইয়াছে 'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈ তৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি' (১'৭৫) এবং 'যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো, ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ' (৪'৪),—ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবও যাঁহার শক্তি বর্ণনা করিতে পারেন না।

৭৪। চণ্ডী ১১'৩-৬

৭৫। মহামায়ার এই প্রসন্নতা-লাভই গীতার 'প্রসাদমধিগচ্ছতি' (২'৬৪), 'আপূর্যমাণচলপ্রতিষ্ঠং' (২'৭০) 'স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' (১৪'২৬) এবং 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে' (১৮'৫৫) প্রভৃতি কথার পরিপূর্ণতারূপ স্থিতপ্রজ্ঞত্ব-প্রাপ্তি। এই 'প্রসাদ' লাভ হইলে 'সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে'—মানুষের সমস্ত দুঃখ বা বন্ধন দূর হইয়া যায় এবং 'বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে'—বুদ্ধি বা

হ্রী

শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ হয়। আচার্য শংকর এইজন্য এখানে 'প্রসন্ন-চেতসঃ'—শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'স্বস্থান্তঃকরণস্য'। এখানে মানুষ 'আকাশম্ ইব * * আত্মস্বরূপেণ এব নিশ্চলীভবতি' —উপশান্ত হইয়া থাকে। প্রসন্নতার প্রকৃত অর্থ অন্তাকরণের স্বরূপ অবস্থায় স্থিতি। এই অন্তঃকরণ একদিকে ঈশ্বর, চৈতন্য, বুদ্ধি, প্রাণ, প্রজ্ঞা, অব্যক্ত, নাদ ও জীবরূপে প্রতিভাত এবং অন্যদিকে সর্বোপাধিবিহীন নিষ্কল পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনিই সমষ্টিতে বিদ্যা বা পরাপ্রকৃতি—'বিদ্যাঃ সমস্তাঃ' এবং ব্যষ্টিতে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতি—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' অন্তঃকরণের বিক্ষুব্ধিই সৃষ্টি ও দুঃখ এবং তাহারই প্রসন্নতায় বা স্বরূপাবস্থায় হয় জ্ঞান লাভ, শান্তি ও মুক্তি। এজন্য মহামায়াকে এখানে বলা হইয়াছে—'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ,'—হে দেবী, আপনি প্রসন্না হইলে সকলে পরমা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।